সেকালের কথা

উপেন্দ্রকিশোর
রায়চৌধুরী



সেকালের কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৮৯

প্রকাশিকা :
অন্নপূর্ণা দাস
মেদিনীপুর

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

অলংকরণে :
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
রাহুল মজুমদার

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণ আর্ট প্রেস
৩, ইডেন হসপিটাল লেন,
কলিকাতা-৭০০০১২

মূল্য : আট টাকা

গ্রন্থকারের নিবেদন

অবসরকালে পড়িয়া বালকবালিকাগণ শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করিবে, এই আশায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইল। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক হইলেও, সে হিসাবে তাহার কোনরূপ চর্চ্চার চেষ্টা হয় নাই ; বালকবালিকাদিগের প্রাচীন কালের কাহিনী শুনাইবার জন্যই এই পুস্তক লেখা ; বিজ্ঞানের কথা বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ছেলেদিগকে যেরূপ করিয়া জানোয়ারের গল্প শুনাইলে তাহারা আমোদ পায়, সেইরূপ সহজ কথায় সরল ভাবে এই পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং সকল কথাই বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে মাপিয়া বলা সম্ভব হয় নাই, আর তাহার আবশ্যকও বোধ হয় নাই। আশা করি, এ সম্বন্ধে ত্রুটি অল্পই হইয়াছে, এবং আমার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে তাহাও মার্জনা করিবেন।

এই পুস্তকে ১৭ খানি বড় বড় ছবি আছে। এই সকল ছবি এই পুস্তকের জন্যই বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল ; ইহাদের একটিও ইংরাজি পুস্তকের ছবির নকল নহে। পুস্তকের ভাষা ও বিষয়সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এই ছবিগুলির সম্বন্ধেও আমার তাহাই বক্তব্য ! ছবিগুলি আঁকিবার সময় উহাদিগকে যথাসম্ভব নির্দোষ করিতে যতদূর চেষ্টা ছিল, শিশুদিগের হিসাবে সুন্দর করিতে তদপেক্ষা অধিক চেষ্টা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, যত ভাল করিয়া আঁকা উচিত ছিল, তাহা পারি নাই। তথাপি আশা করি, এই সকল ছবিতে বৈজ্ঞানিক হিসাবে গুরুতর ত্রুটি লক্ষিত হইবে না ; কারণ এই ছবিগুলি দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন !

বর্ণিত জন্তুগুলির ইংরাজি নামই রাখিয়াছি। এই সকল নামকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল কি না, জানি না। আমি ইংরাজি নামগুলির বাঙ্গালা অর্থ বলিয়া দিয়াই যথেষ্ট মনে করিয়াছি ! ইহাদের যথোচিত বাঙ্গালা পরিভাষা রচনা করা, আমার সাধ্যের অতীত। আর, তাহা আমাদের প্রয়োজনেরও বহির্ভূত ; কারণ এখানি গল্পের বই—বৈজ্ঞানিক পাঠ্য পুস্তক নহে।

কলিকাতার যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে যাদুঘরে রক্ষিত কোন কোন দ্রব্যের ছবি মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এজন্য, এবং এতদুপলক্ষে আমি তাঁহাদের নিকট যে সরল সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

"সেকালের কথা" প্রথমে মুকুল নামক মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। তাহাকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া এই পুস্তক হইয়াছে। মুকুলে যে সকল ছবি বাহির হইয়াছিল, তাহা এ পুস্তকে গ্রহণ করা হয় নাই ; ইহার ছবিগুলি সমস্তই নূতন। ইতি—

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী.

এই বই-এর ছবিগুলি মূল ছবি থেকে রূপান্তরিত করেছেন রাহুল মজুমদার।

সেকালের কথা

যাহা কেহ দেখে নাই, তাহা কেমন ছিল, তাহা কি বলা যায় ?

অনেক সময় যায় বইকি। তোমরা সেই ফকির আর হারানো উটের গল্প শুন নাই ? ফকির উটটাকে না দেখিয়াই বলিয়াছিলেন যে, সেটা পলাতক, কানা এবং খোঁড়া ; সেটার একটা দাঁত নাই, আর পিঠে চিনি এবং মধুর বোঝা।

স্কুলে বেত খাইলে, বাড়িতে আসিয়া তাহা বলিবার জন্য কেহ ব্যস্ত হয় না। কিন্তু বাড়ির লোকে পিঠে দাগ দেখিয়া অনেক সময়ই তাহা বুঝিয়া ফেলে। অথচ বেত খাইবার সময় সচরাচর বাড়ির লোক স্থলে উপস্থিত থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঘটনার সময় সেখানে না থাকিলেও তাহার কথা জানা একেবারে অসম্ভব নহে, কারণ তাহার চিহ্ন বর্তমান থাকিতে পারে।

পৃথিবীতে এইরূপ অনেক ঘটনার চিহ্ন রহিয়াছে। যে-সকল ঘটনা ঘটিতে আমরা কেহ দেখি নাই, কিন্তু তাহার চিহ্ন দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। এইরূপে পৃথিবী এবং জীব জন্তুর প্রাচীন কালের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা গিয়াছে।

আমরা হয়ত মনে করি যে, এই পৃথিবীকে এখন আমরা যেরূপ দেখিতেছি সে চিরকালই এইরূপ ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে অতীত কালের যে-সকল ঘটনার চিহ্ন রহিয়াছে, তাহার কথা ভাবিয়া দেখিলে আর এ ভ্রম থাকে না। এ মনুষ্য জাতিটারই যে কতরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

পৃথিবীর স্থানে স্থানে প্রাচীন কালের নানা জাতীয় মনুষ্যের চিহ্ন অদ্যাপি দেখা যায়। সে-সকল লোক আর এখন নাই, কিন্তু এই চিহ্নগুলির ভিতরে তাহারা তাহাদের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। পর্বতের গুহায় প্রাচীনকালের মানুষের হাড় আর তাহাদের ব্যবহারের নানারকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এই-সকল জিনিস দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, আজকাল মানুষের অবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, অতি প্রাচীনকালে তাহার নিতান্ত হীন অবস্থা ছিল। আমি লেখাপড়া বা টাকাকড়ির কথা বলিতেছি না। যখন মানুষের ঘর-বাড়ি ছিল না, বাসনপত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা ছিল না, পাথরের কুচি, জন্তুর হাড় বা গাছের কাঁটা ভিন্ন অস্ত্র ছিল না, তখন তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল একবার ভাবিয়া দেখ।

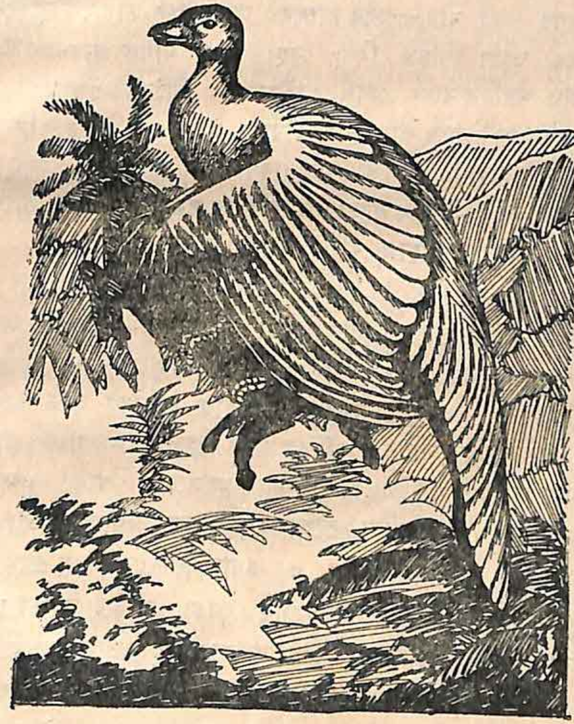
এই-সকল মানুষের বুদ্ধি কতখানি ছিল, তাহাদের মাথার হাড় পরীক্ষা করিয়া এখনকার পণ্ডিতেরা তাহা স্থির করিয়াছেন। সে বুদ্ধি অনেক স্থলে একটা বানরের বুদ্ধির চাইতে বেশি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কয়েক বৎসর পূর্বে খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম যে, কথা কহিতে জানিত না—সে শক্তিটাই

তাহার ছিল না—এমন মানুষের হাড়ও নাকি পাওয়া গিয়াছে। বানরেরও ভাষা আছে, এ কথা আজকালকার কোন কোন পণ্ডিত বলেন; এমন-কি তাঁহারা সেই ভাষা শিক্ষার জন্য চেষ্টাও করিতেছেন। একথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, ঐ ভাষাহীন মানুষটার বুদ্ধি বানরের বুদ্ধির চাইতেও কম ছিল।

মানুষ ত সেদিনকার জন্তু। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মনুষ্য জাতির বয়স অতি সামান্যই বলিতে হইবে। এখন মানুষ মনে করে যে, সে পৃথিবীর রাজা, কিন্তু দুদিন আগে এই পৃথিবীতে তাহার নামও কেহ জানিত না।

আমাদের এই পৃথিবী যে কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, তাহার ঢের বয়স হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাহার ভিতরে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

প্রথমে পৃথিবী আগুনের মত গরম ছিল, পরে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া তাহার বর্তমান অবস্থা পাইয়াছে! এখন যেরূপ জীবজন্তু আর গাছপালা দেখিতেছি,



আর্কিঅপ্টেরিক্স্

কযেক লক্ষ বৎসর পূর্বে তাহার কিছুই ছিল না। আবার অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী একেবারেই জীবজন্তুর বাসের অনুপযুক্ত ছিল। তারপর সে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়াছে, আর তাহার অবস্থার উপযোগী জীবসকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সকলের আগে কিরূপ জন্তু জন্মাইয়াছিল, তাহা বলা সম্ভব নহে।

পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সে-সকল জন্তু লোপ পাইয়াছে, আর হয়ত কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

জন্তু আবার লোপ পায়?

হ্যাঁ, পায়। বর্তমান সময়ে বলিতে গেলে আমাদের চোখের সামনেই কতকগুলি জন্তু লোপ পাইয়াছে। নিউজীলণ্ড দ্বীপে 'মোয়া' নামক একপ্রকার অতি বৃহৎ পক্ষী ছিল। প্রাচীন ভ্রমণকারীদের কেহ কেহ এই পক্ষী দেখিয়াছেন, এমন কথাও শুনা যায়। কিন্তু এখন আর সে পাখি নাই। মোয়ার ডিম এবং কঙ্কাল এখনো মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু জীবিত মোয়া আর দেখা যায় না। মাদাগাস্কার দ্বীপে 'ডোডো' নামক আর-এক প্রকার পাখি ছিল। এই পাখি পায়রার জাতীয়। সে উড়িতে জানিত না, অথচ খাইতে খুব ভাল ছিল। কোন কোন সাহেব এই পাখি খাইয়া তাহার অতিশয় সুমিষ্ট বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা খাইতে এত ভাল লাগে, তাহাকে যদি এত সহজে শিকার করা যায়,—তবে মানুষের মত রাক্ষস তাহাকে দুদিনে খাইয়া শেষ করিবে, তাহা বিচিত্র কি? বৃহৎ 'অক্' নামক আর-একটি পাখিও এইরূপে অতি অল্পদিন যাবৎ লোপ পাইয়াছে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলে এক সময়ে এই পক্ষী লাখে লাখে বাস করিত। ইহারও উড়িবার শক্তি ছিল না, কিন্তু জলে সাঁতরাইবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। স্থলে ইহারা ভালরূপ চলিতে পারিত না। ঐ পথে যাতায়াত করিবার সময় জাহাজের লোকেরা লাঠি দ্বারা এই পক্ষী মারিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত।

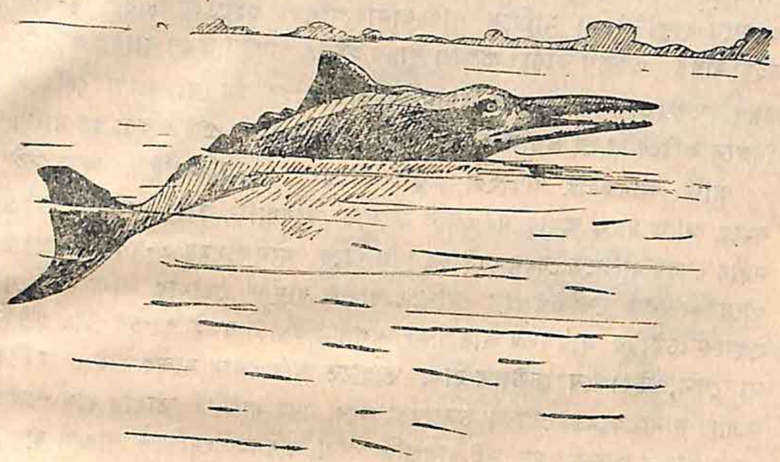
'ম্যামথ্' নামক একপ্রকার লোমওয়ালা হাতি ছিল, তাহাও খুব বেশিদিন হয় নাই লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন অসভ্য লোকেদের সময়ে এই জন্তু বর্তমান ছিল। তাহারা ইহার চেহারা আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

আয়র্লণ্ড দেশে 'এল্ক্' নামক একপ্রকার হরিণের হাড় পাওয়া যায়। এখন সে জন্তু জীবিত নাই। এই জন্তু যখন ছিল, তখন মানুষও নাকি ছিল; আর তাহারা তাহাকে মারিয়া খাইত, এরূপ অনেকের বিশ্বাস। এল্কের হাড়ে নাকি অনেক সময় সেই প্রাচীন মনুষ্যের অস্ত্রের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং জন্তু যে লোপ পায়, এ কথায় সন্দেহের কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপে কত জন্তু যে লোপ পাইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। অদ্যাপি যাহাদের চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু সকলেই ত আর চিহ্ন রাখিয়া মরিবার অবসর পায় না। একশতটির মধ্যে একটির এরূপ সৌভাগ্য হয় কি না সন্দেহ। মাংস চামড়া ইত্যাদি কোমল জিনিস ত পচিয়াই যায়। অস্থানে পড়িলে হাড়েরও সেই দশাই হয়। শরীরের মধ্যে কেবল দাঁতগুলিই যা একটু মজবুত; সেগুলি অনেকদিন থাকে। এইজন্য জন্তুর অন্যান্য অংশের চাইতে দাঁতই বেশি পাওয়া যায়। কোন-কোন জন্তুর কেবল দাঁতই পাওয়া গিয়াছে, আর কিছু এখনো পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ সামান্য চিহ্ন দেখিয়া একটা জন্তুর পরিচয় সংগ্রহ করা কম

ক্ষমতার কার্য নহে। যাঁহারা সমস্ত জীবন ধরিয়া খালি জন্তুর শরীর-গঠন সম্বন্ধে চর্চা করেন তাঁহাদেরই ঐরূপ ক্ষমতা জন্মানো সম্ভব হয়। জন্তুর স্বভাবের উপযোগী করিয়া তাহার শরীরের প্রত্যেক অংশ গঠিত হইয়াছে স্থতরাং যাঁহারা রীতিমত এ বিষয়ে চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য একটি হাড়ের টুকরা মাত্র দেখিয়াই অনেক সময় বলিতে পারেন যে, সেই হাড় কিরূপ জন্তুর এবং সেই জন্তুর স্বভাব কিরূপ ছিল।



মাছের মতন চেহারাওয়ালা অতি ভয়ঙ্কর সেকালের কুমির। প্রায় ৪০ ফুট লম্বা হইত

এইরূপে সেকালের জন্তুদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। এই সকল জন্তুর কোন্‌টা ঠিক কতদিন পূর্বে পৃথিবীতে ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই, তবে মোটামুটি কোন্ জন্তুটা আগেকার, কোন্‌টা পরের, তাহা অনেক সময় সহজেই স্থির হইতে পারে। পৃথিবীর শরীরটা নানারকম মাটি এবং পাথর দিয়া গড়া। মোটামুটি এ কথা বলা যায় যে, নীচের মাটি অথবা পাথর আগেকার, উপরের মাটি অথবা পাথর পরের। যদি এরূপ দেখা যায় যে, কোন-একপ্রকারের মৃত্তিকা সর্বদাই অন্য-কোনপ্রকারের মৃত্তিকার উপরে থাকে, নীচে কখনো থাকে না, তবে এ কথা মনে করা অসঙ্গত হয় না যে, ঐ নীচেকার মাটি উপরকার মাটির চাইতে পুরাতন। এইরূপ করিয়া নানারকম মাটি এবং পাথরের বয়স স্থির হইয়া থাকে এবং ঐ-সকল মাটিতে অথবা পাথরে যে জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহারও ঐরূপ বয়সই সাব্যস্ত হয়।

এইরূপ দেখা যায় যে, শামুক, গুগলি প্রভৃতি জাতীয় জন্তু সকলের আগে জন্মিয়াছিল। মাছ, কুমির ইত্যাদি তাহার পরে। শেষে স্তন্যপায়ী* জন্তু, এবং তাহাদের ভিতরে আবার মানুষ সকলের শেষে জন্মিয়াছে।

* অর্থাৎ যাহারা শিশুকালে মায়ের দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করে। সকল জন্তুর মধ্যে এই শ্রেণীর জন্তুই শ্রেষ্ঠ। মানুষও এই শ্রেণীর জন্তু।

আমরা একবার চুনার গিয়াছিলাম। সেখানে বেলে পাথরের পাহাড় আছে। সেই পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া আনিয়া লোকে ঘর-বাড়ি তয়ের করে। সে পাথর কি করিয়া কাটে, জান? কাঠ চিরিবার মতন করিয়া করাতের দ্বারা তাহা কাটা হয় না। ইহার উপায় অন্যরূপ।

পুস্তকে যেমনভাবে পাতাগুলি থাকে, সেই-সকল পাহাড়ে তেমনি করিয়া পাথরের পাত সাজানো থাকে, ঐ-সকল পাতের মাঝখানে লোহার ছেনি ঢুকাইয়া তাহাতে হাতুড়ির ঘা মারিলে পাথরখানা আপনা হইতেই চিরিয়া দু-ভাগ হইয়া যায়। এইরূপ করিয়া প্রকাণ্ড পাথর হইতে পাতলা তক্তা বাহির করিতে হয়। তক্তাগুলি অনেক সময় এমনি পরিষ্কার বাহির হয় যে, তাহা দেখিলে বিশ্বাস করিবে না যে ওগুলি এক-একখানা করিয়া হাতে প্রস্তুত করা হয় নাই।

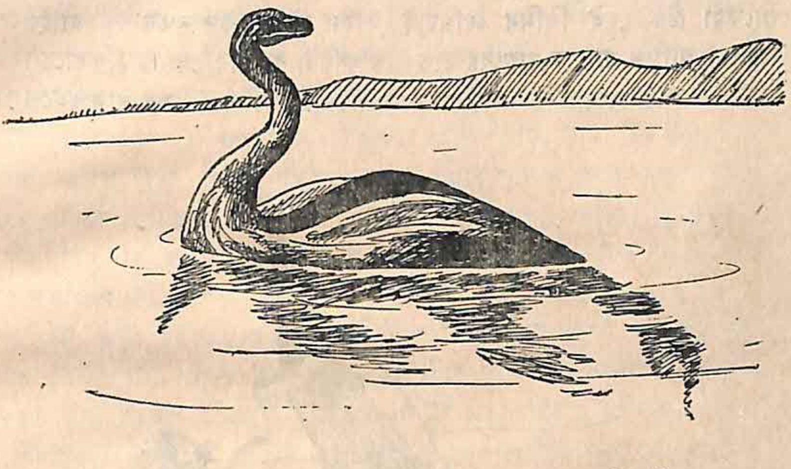
আমি অনেকবার দাঁড়াইয়া ঐরূপ পাথর চেরা দেখিয়াছি। আর সেই সময়ে মাঝে মাঝে আর যে একটা ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা অতি আশ্চর্য। নদীর চড়ায় বালিতে যেমন ঢেউয়ের দাগ থাকে, অনেক সময় ঐ-সকল পাথরের গায়ে অবিকল সেইরূপ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমায় সাধ্য নাই যে উহাকে ঢেউয়ের দাগ ভিন্ন আর কিছু বল। কথাটা যতই আশ্চর্য বোধ হউক না কেন, উহা যে ঢেউয়ের দাগ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। নদীর তলায় নানারকমের পোকা চলাফেরা করে, নরম মাটিতে তাহার দাগ পড়ে। বেলে পাথরে অনেক সময় সেই দাগগুলি পর্যন্ত অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। চুনারের পাথরে আমি অনেক খুঁজিয়াও ঐরূপ দাগ দেখিতে পাই নাই বটে, কিন্তু ঐরূপ দাগওয়ালা পাথর অন্য স্থান হইতে কলিকাতার জাদুঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। যাহাদের সুবিধা আছে, ইচ্ছা করিলেই গিয়া দেখিয়া আসিতে পার। উড়িষ্যার অন্তর্গত তালচিরের পাহাড়ে এইরূপ পাথর পাওয়া যায়।

বেলে পাথর আর নদীর তলার বালিতে প্রভেদ খালি এই যে, একটা এখনো কোমল রহিয়াছে, আর একটা কোন কারণে জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। জিনিস একই।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে ঐ বেলে পাথর হয়ত কোন নদী অথবা হ্রদের তলায় ছিল। আজ তাহার কাছে দাঁড়াইয়া যেন সেই লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের পৃথিবীকে হঠাৎ সামনে দেখিতে পাইতেছি। তখনকার পৃথিবী কিরূপ ছিল? তখনো কি আমাদের আজকালকার গাছপালার মতন গাছপালা হইত? মানুষ তখন ছিল কি?

কি আশ্চর্য! দেখ—বড়-বড় রাজারা মৃত্যুর পরে তাঁহাদের চিহ্ন রাখিয়া যাইবার জন্য কত ব্যস্ত হন, কিন্তু কালে সেই-সকল চিহ্নের কিছুই থাকে না। পাথরের গোরস্থান বল, কীর্তিস্তম্ভ বল, এ-সকল আর ক'হাজায় বৎসর থাকে? কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার পোকা—মনুষ্য জাতির জন্মের কত যুগ পূর্বে কোন্‌খান দিয়া সে চলাফেরা করিয়াছিল, তাহার পায়ের দাগ আজও পাথরে খোদা রহিয়াছে।

পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাসে আলোচনা করিলে আমাদের অহঙ্কার একটু কমে। দুদিন আগে আমরা কোথায় ছিলাম, দুদিন পরে হয়ত বা কোথায় থাকিব! এরপর আবার কোন্‌দিন হয়ত আমাদের চাইতে ঢের বুদ্ধিমান কোন জন্তু পৃথিবীতে আসিবে। তাহারা পাথর খুঁড়িয়া আমাদের হাড় বাহির করিয়া তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহা আমাদের পক্ষে সুখ্যাতির বিষয় না হইতেও পারে! প্রাচীনকালের জন্তুরা যেমন তাহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, সেরূপ সৌভাগ্য আমাদের হইবে কি না, তাহাই বা কে জানে।



যাহা বলিতেছিলাম। চুনারের পাথরে ঢেউয়ের দাগ দেখিয়াছি। অবশ্য, এ কথাটা সহজেই বুঝিতে পারি যে, পাথরের উপরে ঢেউয়ের দাগ পড়া সহজ নহে। সুতরাং ঐ ঢেউয়ের দাগ যখন পড়িয়াছিল, তখন যে ঐ জিনিসটা সাধারণ নদীর তলার মতনই কোমল ছিল, পাথর ছিল না, এ কথা নিশ্চয়। শেষে কোন কারণে ঐ জিনিস জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়াছে।

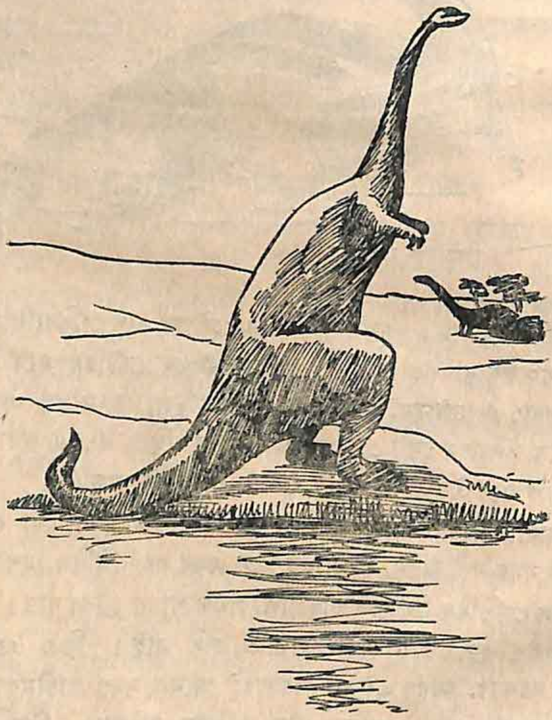
বালি জমাট বাঁধিয়া বেলে পাথর হয়, কাদা জমাট বাঁধিয়া স্লেট পাথর হয়। অনেক সময় নদী ঝরনা ইত্যাদির জলে এমন সব জিনিস মিশানো থাকে যে, সেই জলে বেশিদিন ভিজিলে গাছপালা পর্যন্ত পাথর হইয়া যায়।

কেন এরূপ হয়, তাহা এখন বলিতে বসি নাই। কিন্তু এরূপ যে হয় তাহা বলার দরকার, কারণ এইরূপ অবস্থায়ই অনেক সময় প্রাচীনকালের জীব-জন্তুর হাড় পাওয়া যায়। হাড়ের গঠন অবিকল রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হয়ত আর এখন হাড় নাই—পাথর হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ পাথর হইয়া না গেলে, হয়ত সে হাড় এতদিন থাকিত না, আর আমরাও তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতাম না।

পাথর খুঁড়িতে গিয়া জীবজন্তুর চিহ্ন অনেক সময়ই পাওয়া যায়। আগেকার লোকেরা ঐরূপ চিহ্ন পাইলে তাহাকে খুব একটা তামাশার ভাবে

দেখিত বটে ; কিন্তু উহা যে বাস্তবিকই একটা জন্তুর চিহ্ন, তাহা তাহারা মনে করিত না। অনেক সময় গোল আলুতে মানুষের মতন নাক মুখ থাকে। কলিকাতার মহামেলায় একটা লাউ দেখিয়া ছিলাম, তাহাতেও ঐরূপ নাক মুখ ছিল। এরূপ ঘটনা অবশ্য হঠাৎ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বাস্তবিকই যে উহা মানুষের নাক মুখ, তাহা নহে। ঐ পাথরগুলি সম্বন্ধেও আগে লোকে ঐরূপ মনে করিত। ইহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগিয়াছে।

এক জিনিসকে সকলে সমানভাবে দেখে না। সাধারণ লোকে যাহা দেখিয়া একটা সাদাসিধা অর্থ করে, আর অনেক সময়ই হয়ত ভুল করে, বিদ্বান লোকেরা ঠিক সেই জিনিস দেখিয়াই তাহা হইতে কত নূতন কথা বাহির করেন। হাতির হাড়কে মানুষের হাড় মনে করিয়া কতবার লোকে ঠকিয়াছে। একটি ভদ্রলোক অনেকদিন কোন পাহাড়ে জায়গায় ছিলেন। সেই স্থান হইতে



ব্রণ্টোসোরস্
১৫৬ ফুট লম্বা নিরামিষভোজী ডাইনোসর। তিমি ভিন্ন এত বড় জন্তু আর পৃথিবীতে নাই

ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সেদেশে নাকি এখনো দানবের হাড় পাওয়া যায়, আর সেই হাড় নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন,

উহা যে হাতির হাড়, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। ফ্রান্স দেশে একবার এইরূপ কতকগুলি হাড় পাওয়া গিয়াছিল। এক ডাক্তার সেই হাড়গুলি কিনিয়া সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, ওগুলি রাজা টিউটোবোকসের হাড়—সে একটা প্রকাণ্ড গোরের ভিতরে তাহা পাইয়াছে। সে আরো বলিল যে, সেই গোরটা ৩০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া ছিল, আর তাহার উপরে লেখা ছিল "রাজা টিউটোবোকস"।

এই কথা যে শুনে সেই অবাক হয়। ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই পর্যন্ত ঐ হাড় দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। রিয়োলা নামক একজন পণ্ডিত ঐ হাড়গুলি দেখিয়া বলিলেন যে, ওগুলো মানুষের হাড় নয়, হাতির হাড়। ইহাতে প্রথমে অনেকই তাঁহার উপর ভারি বিরক্ত হইল। যাহা হউক, শেষে ইহাই স্থির হইল যে, উহা মানুষের হাড়ও নহে, অথচ ঠিক আজকালকার হাতির হাড়ও নহে। ওগুলি যে একপ্রকার হাতির হাড়, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু ওরূপ হাতি এখন আর পৃথিবীতে নাই। ইহার পরে ঐ জন্তুর আরো অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা ইহাকে এখন বেশ ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, আর ইহার নাম দিয়াছেন "ম্যাস্টোডন"। এই জন্তু হাতির চাইতেও বড় ছিল। যে কঙ্কালের কথা বলিলাম তাহা পঁচিশ ফুট লম্বা, আর দশ ফুট চওড়া।

এই ঘটনা হইতেও এ কথা জানিতে পারিতেছি যে, প্রাচীনকালের এমন জন্তু ছিল, যাহা এখন আর নাই। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালের যে-সকল জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই এখন বাঁচিয়া নাই ; সব লোপ পাইয়াছে। এমন সব অদ্ভুত জন্তু এক সময়ে পৃথিবীতে ছিল যে, দিদিমার গল্পের ভিতরেও তেমন আশ্চর্য জন্তুর কথা থাকে না।

পৃথিবীর প্রাচীনকালের ইতিহাস অতি আশ্চর্য। তোমরা গল্প শুনিয়া কত আমোদ পাও, কিন্তু পৃথিবীর কথা শুনিলে হয়ত মনে করিবে যে, গল্পের চাইতে সত্য কথার ভিতরেই বেশি আমোদ।

পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন কথা যদি ঠিক করিয়া বলা যায়, তবে তাহা এই যে, এখন যেমন দেখিতেছ, পৃথিবী চিরকাল তেমন ছিল না। কিছুদিন আগে আমরা এ পৃথিবীতে ছিলাম না ; আর এ কথাও নিশ্চয় যে, আর কিছুদিন পরে আমরা কেহই এ পৃথিবীতে থাকিব না। এই যে কলকাতা শহর, দুইশত বৎসর আগে এই শহরই কোথায় ছিল! এখন যেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়িতে সাহেবরা বাস করেন, দুইশত বৎসর আগে সেখানে কুমিরেরা রোদ পোহাইত, আর বাঘেরা শিকার খুঁজিয়া বেড়াইত। এমন লোক এখনো বাঁচিয়া আছে, যাহারা ছেলেবেলায় কলিকাতার অনেক স্থানে প্রকাণ্ড বন দেখিয়াছে, সেখানে দিনের দুপুরে ডাকাতি হইত।

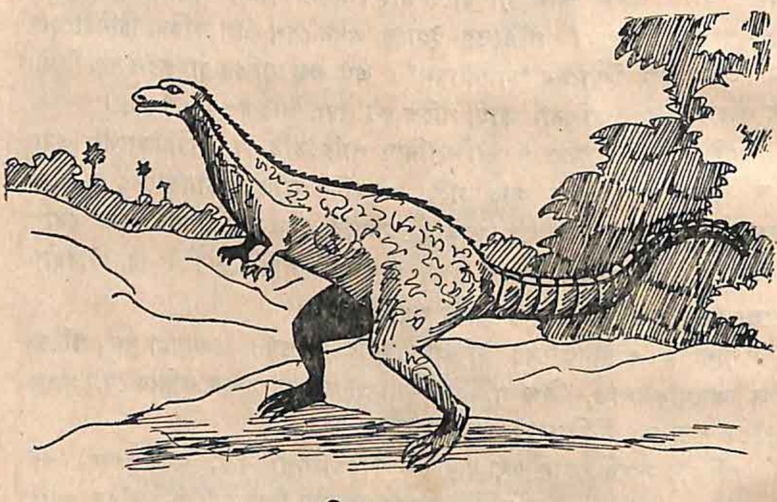
এ-সকল ত নিতান্তই আজকালকার কথা, প্রাচীনকালের অবস্থা আর এখনকার অবস্থায় ইহা অপেক্ষা আরো ঢের বেশি তফাৎ ছিল। রানীগঞ্জ অঞ্চলে এমন সব চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাতে বোধ হয় যেন সে-সকল স্থানে এক

সময়ে বরফে ঢাকা ছিল। অধিক কথায় কাজ কি, এই যে হিমালয় পর্বত —যাহার সমান উঁচু পর্বত পৃথিবীতে নাই বলিয়া আমরা এত অহঙ্কার করি— এই হিমালয় এককালে ছিল না। অন্তত তাহা এত বড় ছিল না।

তোমরা শুনিলে আশ্চর্য হইবে যে, হিমালয়ে এমন সব জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যে তাহারা সমুদ্রে থাকে। যদি এ কথা সত্য হয় যে ওখানে এক সময়ে সমুদ্র ছিল, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদের ভারতবর্ষের চেহারাটা তখন কিরকম ছিল!

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যে-সকল পাহাড় আছে তাহার অনেকগুলির অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষ ঐ-সকল পাহাড়ের সমান উঁচু ছিল। ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি নানা কারণে পৃথিবীর উপরটা ক্রমেই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এইরূপ কারণে এক সময়ের সেই উঁচু ভারতবর্ষ ক্রমে ক্ষয় হইয়া আজকাল ঐ পাহাড়গুলি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

কেবল ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সকল স্থানেই এইরূপ। উত্তর মেরুর



মিগালোসোরস্

মাংসখেকো ডাইনোসর। বাঘের মতন হিংস্র ছিল ; হাতির মতন বড় ছিল ; ক্যাঙারুর মতন লাফাইতে পারিত ; মানুষের মতন দু-পায় ছুটিয়া বেড়াইত!

কাছে প্রাচীন কালের যে-সকল চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এক সময়ে সে স্থানটি আমাদের দেশের মতন গরম ছিল।

যেখানে যাও, সেখানেই এইরূপ দেখিবে। ঠাণ্ডা দেশ হয়ত এককালে গরম ছিল, গরম দেশ এককালে ঠাণ্ডা ছিল! ঐ যে উঁচু পর্বত, সমুদ্রের তলায় তাহার জন্ম হইয়াছিল ; আর ঐ যে সমুদ্র দেখিতেছ, এক সময়ে তাহার স্থানে একটা দেশ ছিল।

পৃথিবীর জন্মাবধি এ পর্যন্ত তাহাতে কত পরিবর্তন যে হইয়াছে, তাহা

আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পাথর পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা ইহার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও অতি সামান্যই বলিতে হইবে; কারণ, পাথরে আর কত বিষয়ের চিহ্ন থাকা সম্ভব হয়? তথাপি, এই সামান্য যেটুকু জানা গিয়াছে তাহাও কম আশ্চর্যের বিষয় নহে।

আজকাল মানুষেরা পৃথিবীতে খুব প্রভুত্ব করিতেছে, কিন্তু দু-তিন লক্ষ বৎসর আগে হয়ত মানুষ বলিয়া একটা জানোয়ারই পৃথিবীতে ছিল না। তখন হাতিদের রাজত্ব ছিল। উত্তর সাইবেরিয়ার এক-এক স্থানে এত হাতির হাড় পাওয়া যায় যে, আজও তাহা দ্বারা প্রকাণ্ড কারবার চলিতেছে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনকালের পাথরে হাতির চিহ্নও পাওয়া যায় না। তখনকার বড়লোক ছিলেন কুমির আর গোসাপ মহাশয়েরা। সে কি যেমন-তেমন কুমির আর গোসাপ? আজকালকার কুমিরেরা ত তাহাদের সামনে টিকটিকি! তাহাদের মাঝারিগুলি চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট লম্বা হইত; বড়-বড়গুলি একশো দেড়শো ফুটের কম হইত না। তাহাদের এক একটা আবার পিছনের পায় ভর দিয়া উঠিয়া চলিতে পারিত। বাস্তবিক, জন্তু হইতে হইলে ঐরকমই হওয়া ভাল। আমরা কি জন্তু? আমরা তো পিঁপড়ে!

যাহা হউক, আরো কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে কুমিরও পৃথিবীতে ছিল না। তখন ছিল খালি মাছ, শামুক আর কাঁকড়া জাতীয় জন্তু। তাহারও পূর্বে হয়ত খালি গাছপালাই ছিল।

তাহার পূর্বে?

তার পূর্বে পৃথিবীতে জীবজন্তু বা গাছপালা কিছুই ছিল না। পৃথিবী এত গরম ছিল যে, তখন তাহাতে জীবজন্তু থাকা সম্ভবই হইত না। আকাশ ধোঁয়ায় আর মেঘে অন্ধকার ছিল; সূর্যের আলো তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পাইত না। পৃথিবীর উপরিভাগ তপ্ত কড়ার মতন গরম ছিল। তাহাতে বৃষ্টি পড়িয়া আবার তখনই উড়িয়া যাইত। ভূমিকম্প ক্রমাগতই হইত। সেই ভূমিকম্পের বেগে মাটি ফাটিয়া পৃথিবীর ভিতরকার গলিত জিনিস বাহির হইত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, আজও পৃথিবীর ভিতরটা এত গরম রহিয়াছে যে, তাহাতে সকল জিনিসই গলিয়া যায়। মাঝে মাঝে আগ্নেয় পর্বতের ভিতর দিয়া ঐ গলানো জিনিস বাহির হয়।

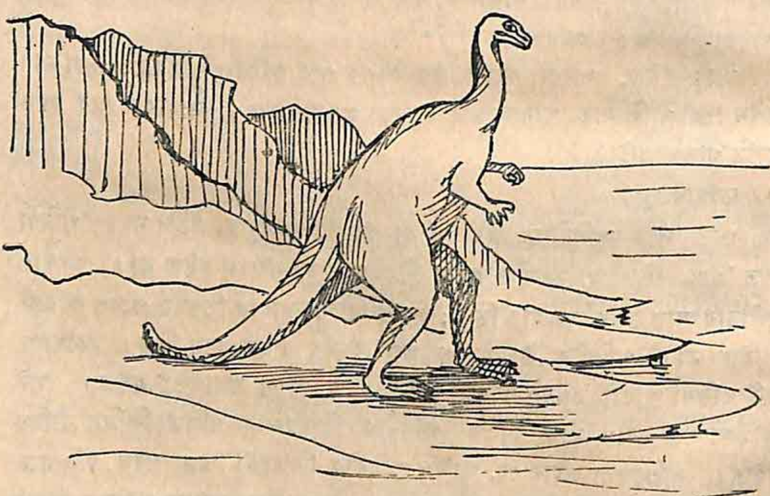
তাহারও পূর্বে পৃথিবী ধোঁয়ার মতন ছিল। তখন সে ঐ সূর্যের ন্যায় জ্বলিত।

বাস্তবিক, সূর্যেরও কালে পৃথিবীর দশা হইবে। সূর্যটা কিনা খুব প্রকাণ্ড, তাই তাহার ঠাণ্ডা হইতে ঢের সময় চাই। এক চামচে গরম দুধ শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া যায়; কিন্তু এক কড়া দুধ হইলে তাহা অনেকক্ষণ গরম থাকে। এইজন্য পৃথিবী শীঘ্র-শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, আর সূর্য এখনো ঠাণ্ডা হইতে পারিতেছে না। চন্দ্র আরো ছোট, তাই সে ইহারই মধ্যে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

সূর্যের প্রায় সমস্তটাই হয়ত এখনো ধোঁয়ার মতন আছে। পৃথিবীর বাহিরের খানিকটা (অনেকে বলেন, প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল) জমাট বাঁধিয়া একটা খোলার মতন হইয়াছে। ভিতরের অবস্থা কিরূপ, তাহা এখনো সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। পূর্বে অনেকে বলিতেন যে, নারিকেলের যেমন ভিতরে জল, বাহিরে মালা, পৃথিবীরও তেমনি ভিতরে তরল পদার্থ, বাহিরে কঠিন আবরণ। কিন্তু আজকালকার বড় বড় পণ্ডিদিগের এই মত যে, পৃথিবীর ভিতরে অতিরিক্ত পরিমাণে তরল পদার্থ থাকা খুব সম্ভব নহে। তবে, সে স্থানটা অতিশয় গরম তাহাতে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রের আগাগোড়াই জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এ-সকল কথায় আমাদের এখন প্রয়োজন নাই। আমরা পৃথিবীর ছেলেবেলার খবর লইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা কতক পাইয়াছি। এখন খালি একটা কথা বলিলেই উপস্থিত কাজটা শেষ হয়। পৃথিবীতে যতরকমের পাথর আছে তাহাক দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পৃথিবীর ভিতরকার গলিত



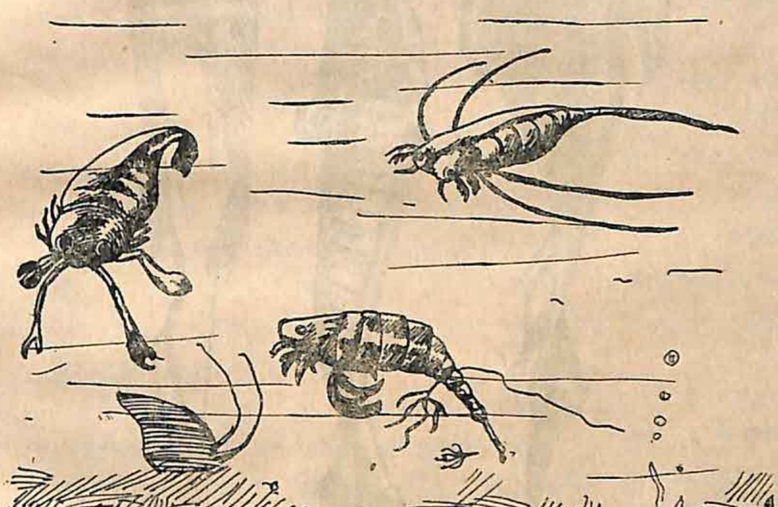
ইগুয়ানোডন্
ত্রিশ ফুট লম্বা নিরামিষভোজী ডাইনোসর

জিনিস বাহিরে আসিয়া কতকগুলি পাথর হইয়াছে। আর পৃথিবীর উপরকার জিনিস ভাঙিয়া চুরিয়া বা অন্য কোন কারণে বদলাইয়া গিয়া আর কতকগুলি পাথর হইয়াছে। বেলে পাথর, শ্লেট পাথর, খড়ি, কয়লা ইত্যাদি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথরের দৃষ্টান্ত। জীবজন্তু বা গাছপালার চিহ্ন যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই-সকল পাথরেই পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে আগে জন্তু হইয়াছিল, কি গাছপালা হইয়াছিল, এ কথার উত্তর দেওয়া একটু কঠিন ; তবে গাছপালা আগে হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

গাছেরা মাটির রস টানিয়া লইয়াই বাঁচিতে পারে, কিন্তু জন্তুদের পক্ষে খালি মাটির রস চুষিয়া বাঁচিয়া থাকা কঠিন।

গাছই বল, আর জন্তুই বল, পৃথিবীর সেই প্রথম অবস্থায় ইহাদের কাহারই খুব বেশি উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। গাছের মধ্যে নানারকমের শেওলা, আর জন্তুর মধ্যে নানারকমের পোকা, ইহারাই পৃথিবীর প্রথম জীব। গুগলি আর চিংড়ি মাছের জাতীয় জন্তুও প্রায় এই সময়েই দেখা দেয়। তখনকার এক-একটা শামুক প্রায় এক-একটা গাড়ির চাকার মতন বড় হইত। চিংড়িগুলিও নিতান্ত কম ছিল না। তাহার দু-একটা কোন পুকুরে আছে জানিতে পারিলে, সে পুকুরে নামিয়া কাহারো স্নান করিতে ভরসা হইত কি না সন্দেহ। আধ হাত লম্বা চিংড়িটা জীবিত থাকিলে তাহার কাছে যাইতে ভয় হয়। সুতরাং সেকালের ছয় ফুট লম্বা চিংড়িগুলি যে এক-একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার ছিল ইহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের বিদ্যাসাধ্যিও কম



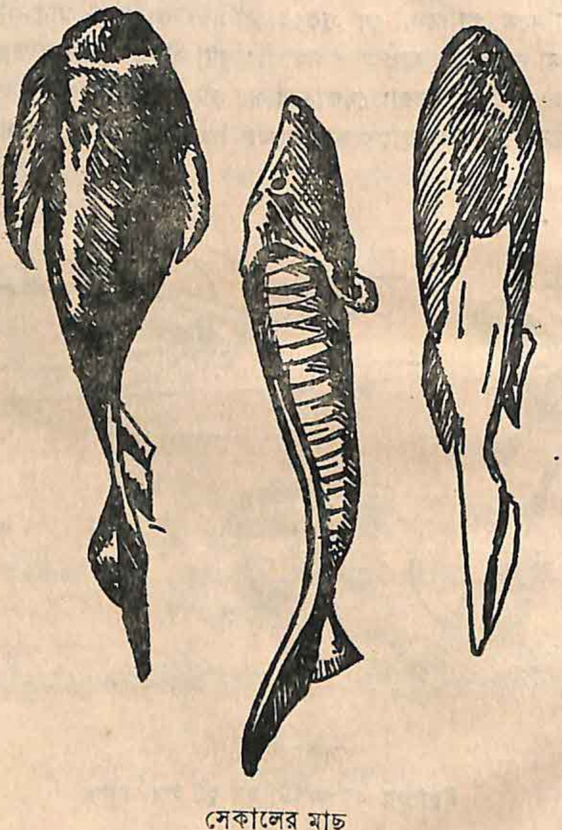
সেকালের চিংড়ি
ইহাদের এক-একটা ছয় ফুট লম্বা হইত

ছিল না। কেহ চিত হইয়া সাঁতরাইত, কেহ কেন্নোর মতন তাল পাকাইয়া থাকিতে পারিত; কেহ আবার পিছনবাগে হটিয়া গিয়া মাটির ভিতর ঢুকিতে পারিত।

এ-সকল চিংড়ি মাছ যে ঠিক আজকালকার চিংড়ি মাছের মতন ছিল না, তাহা ছবি দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে। সকলগুলি আবার এই ছবির মতনও ছিল না। আবার, কোন-কোন বিষয়ে আজকালকার বিচ্ছুগুলির সঙ্গে ইহাদের খুব সাদৃশ্য দেখা যায়।

চিংড়ির পরে পৃথিবীতে মাছের জন্ম হইয়াছিল। এই-সকল মাছের চেহারা কিরূপ ছিল, তাহার নমুনা দেওয়া গেল। এক-একটা দেখিতে কি অদ্ভুত ছিল দেখ, ডানাদুখানি যেন কাঁকড়ার দাঁড়া! শরীরটা একটা শক্ত খোলায় ঢাকা। কেবল লেজটিতে মাত্র যা-একটু মাছের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে পৃথিবী অবশ্য এখনকার চাইতে বেশি গরম ছিল। পৃথিবীর জলের ভাগের বেশিটা হয়ত মেঘের আকারেই ছিল। সুতরাং আকাশ প্রায়ই মেঘলা থাকিত ; সেই মেঘের ভিতরে সূর্যের আলো সহজে প্রবেশ করিতে পাইত না। আজকাল যেমন পৃথিবীর মাঝখানটা খুবই গরম, আর উত্তর



সেকালের মাছ

দক্ষিণ খুবই ঠাণ্ডা, সেকালে তেমন ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। তখন আগাগোড়াই প্রায় এক ভাবের গরম ছিল। বড় বড় সমুদ্র ছিল ; কিন্তু তাহা বেশী গভীর ছিল না। ডাঙা নিচু ছিল, মাটি স্যাঁৎসেতে ছিল।

স্যাঁৎসেতে গরম মাটি পাইয়া গাছপালা খুবই বাড়িয়াছিল। তখনকার বনগুলির মতন গভীর বন হয়ত আজকাল দেখা যায় না। তখনকার গাছপালা দেখিতে বেশ সুন্দরই ছিল, আর খুব বড়ও হইত। যে-সকল গাছের

ছবি দেখিতেছ, তাহাদের এক-একটা ত্রিশ চল্লিশ ফুট হইতে প্রায় একশত ফুট উঁচু হইত। কিন্তু আমাদের আজকালকার তুলনায় এ-সকল গাছ অতি নিম্নশ্রেণীর ছিল। ইহাদের না হইত ফুল, না হইত আমাদের আম কাঁঠালের ন্যায় মিষ্ট মিষ্ট ফল। দেখিতে বড় ছিল, কিন্তু ভিতরে সার, অর্থাৎ যাহাকে 'কাঠ' বলে, তাহা ছিল না।

বাস্তবিক এ-সকল বন নিতান্তই অদ্ভুত ছিল। ফুল নাই, ফল নাই, পাখির গান নাই। গাছগুলি খালি ছাল আর ছোবড়া; তাহাতে চড়িয়া যে একটু আমোদ করিবে তাহারও জো নাই। পোকা ফড়িঙের অভাব ছিল না। এই-সকল বনের ভিতরে একটা ফড়িং পাওয়া গিয়াছে, তাহার ডানা মেলিলে চৌদ্দ ইঞ্চি চওড়া হয়।

আমি বলিতেছিলাম, 'এই-সকল বনের ভিতর একরকম ফড়িং পাওয়া গিয়াছে।' তবে কি সে-সব বন আজও আছে নাকি?

হাঁ আছে বইকি—কিন্তু তাহা মাটির নীচে। সে-সকল গাছকে আর এখন গাছ বলিয়া চিনিতেই পারিবে না—তাহারা কয়লা হইয়া গিয়াছে।

যে পাথুরে কয়লা রানীগঞ্জ, বরাকর, গিরিডি ইত্যাদি অঞ্চল হইতে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, যাহাতে রান্না হয়, রেল-চলে, গ্যাস তয়ের করে—তাহা যে আবার এককালে প্রকাণ্ড বন ছিল, এ কথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? কিন্তু একটিবার স্বচক্ষে দেখিলে আর বিশ্বাস না করিবার জো থাকে না। গাছের ডাল, গাছের পাতা, গাছের গুঁড়ি, গাছের শিকড়—সমস্তই সেখানে দেখিতে পাইবে। কোন-কোন খনিতে ডালপালা শিকড় সুদ্ধ আস্ত গাছ পর্যন্ত পাওয়া যায়। গাছ আর এখন গাছ নাই—সে কয়লা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার গঠন অবিকল রহিয়াছে।

এরূপ মনে করিও না যে, একটা কয়লার খনিতে ঢুকিলেই সেকালের গাছপালাগুলিকে তোমার চোখের সামনে খাড়া দেখিতে পাইবে। আমাদের চোখের সামনে অনেক জিনিসই থাকে, কিন্তু দেখিতে না জানিলে আমরা তাহার কটিকে দেখিতে পাই? আমি যখন কয়লার খনি দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন খনির একটি বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সব দেখাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কয়লা খুঁড়িবার সময় তাঁহাদের লোকেরা কোন গাছপালার চিহ্ন পায় কি না? এই কথার উত্তরে বাবুটি বলিলেন যে, ওরূপ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। অথচ ঐ সকল খনি হইতে ঐরূপ অনেক গাছের চিহ্ন আনিয়া এখানকার জাদুঘরে রাখা হইয়াছে। দুই-তিন শত হাত মাটির নীচে অন্ধকারের ভিতরে মুটেরা কয়লা খোঁড়ে। দিনমানের মধ্যে যত কয়লা তুলিতে পারিবে ততই তাহারা বেশি পয়সা পাইবে, এই কথাই তখন তাহারা ভাবে। সেই কয়লার ভিতরে আবার কোন গাছপালার চিহ্ন থাকিতে পারে, এত কথা তাহারা জানেও না, জানিলেও ঐ অন্ধকারের ভিতরে তাহা সহজে চোখে পড়ে না; চোখে পড়িলেও, তিন ঘণ্টা ধরিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেটুকুকে আস্ত

বাহির করিবার অবসর তাহাদের হয় না। তাহারা ত আর পণ্ডিত নহে, যে সেকালের খবরটা তাহাদের না লইলেই নয়! তাহারা গরিব লোক, পেটের দায়ে কয়লা খুঁড়িতে আসিয়াছে। সুতরাং খনিতে গাছপালার চিহ্ন থাকিলেও তাহারা তাহা দেখিতে না পাইয়া কোদ্‌লাইয়া গুঁড়া করিয়া দেয়। এইজন্যই কয়লার খনির লোকেরা ইহার কোন খবর রাখে না।

কিরূপ করিয়া এত বড়-বড় বন শেষে পাথুরে কয়লা হইল, আর কিরূপ করিয়াই বা তাহা এত মাটির নীচে চাপা পড়িল, এরূপ হইতে না জানি কতদিন লাগিয়াছিল, এ-সকল কথা ভাবিতে গেলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ষাট ফুট পুরু কয়লার থাক হইতে লক্ষ বৎসরেরও অধিক সময় লাগে। ষাট ফুট কয়লা অনেক খনিতেই আছে; কোন-কোন খনিতে প্রায় ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর যদি এ কথা ভাবিয়া দেখা যায় যে, এই একশত কুড়ি ফুট কয়লার সমস্তটা এক সময়ে হয় নাই, তাহা হইলে মানিতে হয় যে, এই পরিমাণ কয়লা হইতে দুই লক্ষ বৎসরের অনেক বেশি সময় লাগিয়াছিল। একটা কয়লার খনিতে মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, যেখানে এক থাক কয়লা, এক থাক মাটি, এরূপ করিয়া প্রায় একশত থাক কয়লা আছে, কেবল কয়লা মাপিলে একশত কুড়ি ফুট হয়, আর মাটি আর কয়লা একসঙ্গে করিয়া মাপিলে দশ হাজার ফুটেরও বেশি হয়। এত কয়লা আর মাটি জমিতে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

শুধু কি কত লক্ষ বৎসর? কত গাছপালা পচিয়া এত কয়লা হইতে পারে, তাহাই একবার ভাবিয়া দেখ না! ষোল ফুট কয়লা হইতে প্রায় তিনশত ফুট গাছপালার দরকার হয়। একশত ফুট কয়লা হইতে যে গাছপালা চাই তাহাতে প্রায় দুই হাজার ফুট উঁচু পাহাড় হয়! এত গাছপালা যাহাতে ছিল সে-সকল বন না জানি কত প্রকাণ্ড ছিল।

গাছপালা জলের নীচে পচিতে পচিতে গরম আর চাপ পাইয়া শেষটা কয়লা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গাছপালাকে এইরূপ অবস্থায় পচাইতে পারিলে তাহা পাথুরে কয়লা হইয়া যায়। মাটি যে অনেক স্থলে একটু একটু করিয়া উঁচু নিচু হয় তাহা বোধ হয় তোমরা জান। পৃথিবীর অনেক স্থলেই এরূপ হইতেছে। সেকালে এই ব্যাপারটা আরো বেশি হইত। তখন একটা প্রকাণ্ড বন জলে ডুবিয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। আর কয়লা হইবার সময় যে এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। কয়লার ভিতরে যে-সকল জিনিস আছে, গাছপালা জলের নীচে পচিয়া তাহা জমিয়া থাকে। খনিতে এক-এক থাক কয়লার উপরে এবং নীচে এক-এক থাক মাটি থাকে; সে মাটি, আর পুকুর বিল ইত্যাদির তলার কাদা একই জিনিস। ঘোলা জল থিতাইয়া ঐরূপ মাটি উৎপন্ন হয়।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এক-একটা বন পচিয়া এক-এক থাক কয়লার জন্ম হইয়াছিল। মাটি নিচু হইয়া যাওয়াতে হয়ত একটা বন জলে ডুবিয়া গেল। সেই জল থিতাইয়া পলি পড়িয়া (ঘোলা জলে মিশানো কাদা তলায় পড়িয়া যাওয়ার নাম 'পলি' পড়া) সেই বন ঢাকা পড়িল। আবার কালে হয়ত সেই জায়গাটা উঁচু হওয়াতে পুনরায় সেখানে শুকনো মাটি হইল, তাহার উপরে আবার বন হইল ; আবার তাহা ডুবিয়া গেল। এইরূপ করিয়া যে এক-এক থাক কয়লা আর এক-এক থাক মাটি ক্রমে সঞ্চয় হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার উপরে যখন দেখি যে অনেক সময় এক-একটা মাটির থাকে তাহার উপরকার গাছপাতার শিকড়গুলি পাওয়া যায়, তখন আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।

ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে বেলে পাথরের পাহাড় আছে। এই পাথরে মাঝে মাঝে একপ্রকার অদ্ভুত জন্তুর পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দাগ-গুলি কতকটা মানুষের হাতের দাগের মতন। এজন্য এই জন্তুর নাম কাইরো-থীরিয়ম্ (হস্ত-জন্তু) রাখা হইয়াছে। ইহার দাঁতের ভিতরকার গঠন অত্যন্ত জটিল বলিয়া ইহার আর-এক নাম ল্যাবিরিন্থোডন্ (জটিল-দন্ত)। এই জন্তু প্রায় ষাঁড়ের মতন বড় হইত। ইহার হাড়ে ব্যাঙের লক্ষণও আছে, কুমিরের লক্ষণও আছে, স্তন্যপায়ী জন্তুর লক্ষণও আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার মাথার হাড় দেখিয়া অনেকে সন্দেহ করেন যে, ইহার কপালে হয়ত একটি ছোট অতিরিক্ত চক্ষু ছিল।

ডর্সেটশায়ারের পাথরে অনেক প্রাচীন জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়। সেই-সকল চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিক্রয় করিলে যে পয়সা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা অনেকের দিন চলে। একটি মেয়ে এইরূপ করিয়া পয়সা উপার্জন করিত। ১৮১১ সালে একদিন সেই মেয়েটি প্রাচীন জন্তুর চিহ্ন খুঁজিতে গিয়া দেখিল যে, একটা জন্তুর হাড় পাহাড়ের গা হইতে খানিক বাহির হইয়া আছে। আর-একটু খুঁজিয়া সে দেখিতে পাইল যে, ঐ হাড়গুলি একটা মস্ত জন্তুর কঙ্কালের অংশ। তখন সে সেই স্থানের আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া সমস্তটা কঙ্কাল বাহির করিল। তারপর মুটে ডাকিয়া পাথরসুদ্ধ সেই কঙ্কালটাকে খুঁড়িয়া তোলা হইল।

এই কঙ্কাল যে জন্তুর, সেটা ত্রিশ ফুট লম্বা ছিল। ইহার পরে এই-জাতীয় জন্তুর আরো কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে ; তাহার কোন-কোনটা প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা। ইহার গঠন কোন-কোন বিষয়ে মাছের মতন, কোন-কোন বিষয়ে গোসাপ আর কুমিরের মতন। এইজন্য ইহার নাম ইকৃথিয়োসোরস্, ("ইকৃথিয়স্"—মাছ ; "সোরস্"—কুমির, গোসাপ ইত্যাদি জাতীয় জন্তু) বা 'মাছ-কুমির' রাখা হইয়াছে।

ইহার মেরুদণ্ডের হাড় মাছের হাড়ের মতন ছিল। মাথা কুমিরের মতন। হাত পা নৌকার দাঁড়ের মতন, অর্থাৎ খালি একটা চ্যাটালো মাংসল জিনিস,

তাহাতে আঙুল নাই—অথচ তাহা মাছের ডানার মতনও নহে। তিমির ডানা ঠিক এইরূপ থাকে।

ইক্‌থিয়োসোরস্ যে সময়ে পৃথিবীতে ছিল, তখন তাহার সমকক্ষ আর কোন জন্তু ছিল না। তাহার দু-ইঞ্চি লম্বা দেড়শত দুইশত ভয়ানক দাঁত দিয়া সে একটিবার যাহাকে ধরিত, তাহার আর রক্ষা ছিল না। নৌকার দাঁড়ের মতন ঐ চারিখানি পা আর ঐ লেজটির সাহায্যে সে জলের ভিতরে না জানি কিরূপ ভয়ানক বেগে ছুটিতে পারিত! পলাইয়া তাহাকে এড়াইবার ভরসা খুব কমই ছিল। তারপর তাহার চোখদুটি। বড় একটা ইক্‌থিয়োসোরসের চোখের গর্ত প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চি চওড়া হইত। এত বড় চোখ দিয়া সে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি দেখিতে পাইত, তাহাতে সন্দেহ কি? এই চোখের গঠন আবার এমনি যে, তাহা দ্বারা ইচ্ছামত দূরবীক্ষণ অথবা অণুবীক্ষণের কাজ চলে। নিতান্ত ছোট জন্তু আর ঢের দূরের জন্তুকেও সে বেশ পরিষ্কার দেখিত।

ইহারা কখনো ডাঙায় উঠিত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহাদের পায়ের গঠন দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহা দিয়া নৌকার দাঁড়ের কার্যই বেশি হইত; ওরূপ পা লইয়া ডাঙায় চলা নিতান্ত সহজ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠিয়া রোদ পোহানোটা বোধহয় চলিত। নিশ্বাস লইবার জন্য ইহারা কুমিরের মতন এক-একবার ভাসিয়া উঠিত।

ইকৃথিয়োসোরসেরা হয়ত মাছই বেশি খাইত। অনেক ইকৃথিয়োসোরসের পেটের ভিতরে খুব ছোট-ছোট ইকৃথিয়োসোরসের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, হয়ত ক্ষুধার সময় অন্য জন্তু না মিলিলে, নিজের বাচ্চাগুলিকে ধরিয়া গিলিতে তাহাদের বেশি আপত্তি ছিল না। আবার অনেকে বলেন, ইকৃথিয়োসোরসের মৃত্যুর সময়ে তাহার পেটে যে বাচ্চা ছিল, ওগুলি তাহাদেরই কঙ্কাল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ কঙ্কাল কেবল এক-জাতীয় ইকৃথিয়োসোরসের পেটের ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, অন্য ইকৃথিয়োসেরাসেরা ডিম পাড়িত, আর এই জাতীয় ইকৃথিয়োসোরস্‌গুলির বাচ্চা হইত।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে বোধ হয় যেন ইক্‌থিয়োসোরস্‌দের হঠাৎ মৃত্যু হয়, আর মৃত্যুর পরেই তাহারা মাটি চাপা পড়ে। কিরূপ ভয়ানক দুর্ঘটনার এরূপ হইয়াছিল, তাহা এখন ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে।

ইকৃথিয়োসোরস্ এই সময়ের জন্তুদের মধ্যে সকলের চাইতে ভয়ানক ছিল বটে, কিন্তু এই সময়ের সকলের চাইতে আশ্চর্য জন্তুর কথা বলিতে হইলে আর-একটি জন্তুর উল্লেখ করিতে হয়। ইহার নাম প্লীসিয়োসোরস্। 'প্লীসিয়স্' বলিতে কাছাকাছি—অথবা অনুরূপ বুঝায়। এই জন্তুর শরীরের গঠন ইকৃথিয়োসোরসের তুলনায় অনেকটা গোসাপ আর কুমিরের কাছাকাছি ছিল।

এ জন্তুটা নিতান্তই অদ্ভুত ছিল। গোসাপের মুখ, কুমিরের দাঁত, সাপের গলা, তিমির ডানা। কেহ-কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার চেহারা দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন একটা সাপের গায় একটা কচ্ছপকে গাঁথিয়া দিয়াছে।

খুব বড় প্লীসিয়োসোরস্‌গুলি প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা হইত বটে, কিন্তু ইহারা ইকৃথিয়োসোরসের ন্যায় ভয়ানক জন্তু ছিল বলিয়া বোধ হয় না। গড়ন হালকা, গায় জোর কম, হাত পা তেমন বেগে ছুটিবার উপযোগী নহে, যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রও সামান্যই বলিতে হইবে। সুতরাং ইহাদিগকে সকল বিষয়েই ইকৃথিয়োসোরস্‌ অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখা যাইতেছে। হয়ত ইহারা ইকৃথিয়োসোরস্‌কে বড়ই ভয় করিয়া চলিত, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলে অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিত।

অল্প জলে ঝোপ-জঙ্গলের ভিতরে গা-ঢাকা দিয়া থাকাকেই প্লীসিয়োসোরস্‌ অধিক নিরাপদ মনে করিত বলিয়া বোধ হয়। তাই বুঝি ঈশ্বর তাহাকে দয়া করিয়া বকের মতন লম্বা গলা দিয়াছিলেন—যেন শিকার কাছে আসিলেই ঐ গলাটি বাড়াইয়া থপ্‌ করিয়া তাহাকে ধরিতে পারে।

ইকৃথিয়োসোরসের ন্যায় ইহাদেরও ডাঙায় চলার ক্ষমতা কম ছিল—হয়ত ছিলই না। জলের ভিতরেও খুব গভীর স্থানে চলা ফেরা করা অপেক্ষা অল্প জলে থাকিতেই ইহাদের সুবিধা হইত। অনেক সময় হয়ত ইহারা হাঁসের মতন গলা বাঁকাইয়া জলের উপরে সাঁতরাইত।

ইকৃথিয়োসোরস্‌ আর প্লীসিয়োসোরস্‌ অনেকরকমের হইত। কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটার মাথা ভারি, কোনটার গলা মোটা, কোনটার ঠোঁট লম্বা। সুতরাং তখনকার সমুদ্র যে নানা জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল, এ কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে; নহিলে এতগুলি মাংসাশী জন্তু কি খাইয়া বাঁচিত?

কোথায় কুমির, আর কোথায় পাখি! কিন্তু পণ্ডিতদের অনেকে বলেন যে, কুমির হইতেই পাখির সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তত এ কথা নিশ্চয় যে, সেকালের কুমিরগুলির ভিতরে অনেক স্থলে পাখির লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। পিছনের পা আর কোমরের হাড়গুলির গঠন আজকালকার উটপাখিগুলির কোমরের হাড় আর পায়ের গঠনের সঙ্গে আশ্চর্যরূপে মিলে।

চলিবার সময় ইহাদের সকলে না হইলেও, অন্তত অনেকে পাখির মতন শুধু পিছনের পায় ভর দিয়াই চলিত। সামনের পা দুখানি পিছনের পায়ের চাইতে ঢের ছোট ছিল; সে দুখানিকে তাহারা পাখির ডানার মতন করিয়া বুকের কাছে গুটাইয়া রাখিত।

পায়ের আঙুলগুলি অনেক স্থলে ঠিক পাখির আঙুলের মতন ছিল। চলিবার সময় তাহাদের পায়ের যে দাগ হইত, তাহাও ঠিক পাখির দাগের মতন। এই-সকল দাগ দেখিয়া প্রথমে লোকে পাখির পায়ের দাগই মনে করিয়াছিল; এবং এই কথা লইয়া দিন-কয়েকের জন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। চিন্তার বিষয় হইল এই যে, পৃথিবীতে এ সময়ে পাখি

ছিল না, অথচ এত বড় বড় পাখির পায়ের দাগ কোথা হইতে আসিল? কোন-কোন স্থলে প্রায় কুড়ি ইঞ্চি লম্বা দাগ দেখা গিয়াছে; আর তাহার এক-একটা দাগ প্রায় পাঁচ ফুট অন্তর পড়িয়াছে।

যাহা হউক এগুলি যে পাখির পায়ের দাগ নয়, দু-একটা জানোয়ারের হাড় আবিষ্কার হইলেই তাহা জানা গেল।

এই সকল জন্তুকে সাধারণভাবে একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া মোটের উপর তাহাদের নাম 'ডাইনোসর' রাখা হইয়াছে। ডাইনোসর শব্দের অর্থ 'ভয়ানক কুমির'। কুমির বলিলেই আমরা তাহাকে যথেষ্ট ভয়ানক মনে করি; তাহার উপর আবার ভয়ানক কুমির! সেটা যে কতখানি ভয়ানক ছিল একবার কল্পনা কর। সাধারণ কুমিরগুলি হাজার ভয়ানক হইলেও তাহারা হামাগুড়ি দিয়া চলে আর জল ছাড়িয়া বেশি দূরে যাইতে পারে না। কিন্তু একটা ডাইনোসর আসিলে সে দশ বার মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিবে না; আর একটিবার সাক্ষাৎ পাইলে তোমারই মতন দুপায়ে ছুটিয়া তোমাকে তাড়া করিবে। ইহার উপর যদি সে একটা হাতির মতন, কি তাহার চাইতেও বড় হয়, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া ঘাড়ে পড়িবার বদ অভ্যাসটাও তাহার থাকে, তবে ব্যাপারখানা কিরকম দাঁড়ায়, বুঝিতেই পার। বড় ভাগ্য যে এরা এখন আর পৃথিবীতে নাই।

যাহা হউক, সকল ডাইনোসরই যে খুব ভয়ানক ছিল তাহা নহে। একে ত ইহাদের সকলগুলি এত বড় হইত না; তাহার উপর আবার খুব প্রকাণ্ড-গুলিরও অনেকে নিরামিষভোজী নিরীহ জন্তু ছিল।

সকলের চাইতে বড় যে ডাইনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই শ্রেণীর নিরীহ জন্তু। ইহার নাম 'ব্রন্টোসোরস্' অর্থাৎ বজ্র-কুম্ভীর। তিমি ভিন্ন এত বড় জন্তু আর পৃথিবীতে নাই। এই জন্তু চলিবার সময় নিশ্চয় মাটি কাঁপিত, আর তাহার গায়ের ধুপ্‌ ধাপ্‌ শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যাইত। আজকালকার এক-একটা টিকটিকি যেমন ট্যাক্-ট্যাক শব্দ করে, ব্রন্টোসোরসের তেমন করার অভ্যাস থাকিলে, সে শব্দ যে বাজ পড়ার শব্দের চাইতে কম হইত, তাহা বোধ হয় না। একটা হাতি চ্যাচাইলে তাহা দুই তিন মাইল দূর হইতে শুনা যায়। ব্রন্টোসোরস্‌ তেমন চ্যাচাইলে হয়ত দশ মাইলের কম তাহার আওয়াজ যাইত না।

কয়েক বৎসর হইল, আমেরিকার 'ইয়োমিং' নামক প্রদেশে একটা ব্রন্টো-সোরসের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই কঙ্কাল একশো ছাপ্পান্ন ফুট লম্বা। ইহার ওজন প্রায় পৌনে ছয়শত মণ। আস্ত জন্তুটা দেড়হাজার মণের কম ভারি ছিল না। তাহার পাঁজরের ভিতরে চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোকের স্থান হয়।

পিছনের পায় ভর দিয়া চলার অভ্যাস ইহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে বেজি যেমন এক-একবার হাত গুটাইয়া উঠিয়া বসে, ব্রন্টোসোরসেরও হয়ত মাঝে-মাঝে ঐরূপ করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিবার অভ্যাস ছিল। উঁচু

গাছের কচি পাতাগুলি খাইতে হয়ত মাঝে-মাঝে তাহার লোভ হইত। তাহা ছাড়া আশে-পাশে ভয়ানক শত্রুর বাস, তাহাদের কোন্‌টা কোন্‌ দিক হইতে আসিয়া আক্রমণ করে, তাহার ঠিকানা ছিল না। সুতরাং এক-একবার চারিদিক দেখিয়া লইবার প্রয়োজনও ছিল।

ব্রণ্টোসোরস্‌ উঠিয়া বসিলে প্রায় একশো ফুট উঁচু হইত। আজকালকার প্রকাণ্ড তাল গাছ আর নারিকেল গাছগুলির আগা খুঁটিয়া খাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই সোজা কাজ ছিল বলিতে হইবে। ঐ ছোট মাথাটি সুদ্ধ তাহার ঐ সরু লম্বা গলাটি গলি-ঘুঁচির ভিতরে অনেক দূর অবধি ঢুকাইয়া সে নিশ্চয়ই অতি সহজে খাবার জিনিস খুঁজিয়া আনিতে পারিত।

এত বড় জানোয়ারের পক্ষে তাহার মাথাটি একটু বেশি ছোট বলিতে হইবে; তাহার ভিতরে মস্তিষ্ক খুব বেশি থাকা অসম্ভব। বাস্তবিক, বুদ্ধিটা একটু মোটা-গোছের ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আজকাল নিরীহ লোক বলিলেই তোমরা বেকুব বুঝিয়া লও। সেকালেও এর দস্তরটা কতক ছিল দেখিতেছি। অস্ত্র-শস্ত্র তাহার শরীরে কিছু ছিল না বলিলেও হয়; বড় বড় নখ-দাঁতওয়ালা মাংসখেকো ডাইনোসরগুলিরও হাত এড়াইবার জন্য তাহার পলায়ন ভিন্ন আর উপায় দেখা যায় না। এখনকার তিমিগুলিরও কতকটা এইরূপ দশা। তিমি-জাতীয় ছোট ছোট হিংস্র জানোয়ারদের ভয়ে তিমি সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকে। তিমিকে দেখিতে পাইলেই উহারা আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করে। ব্রণ্টোসোরসেরও এইরূপ প্রতিবেশী গুটিকতক ছিল। ইহাদের ভয়ে হয়ত অনেক সময়ই বেচারী জলে নামিয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিত। সেখানে গাছপালারও অভাব ছিল না; আর কেহ তাড়া করিলে সাঁতরাইয়া তাহাকে ফাঁকি দেওয়া যাইত। ইহার শরীরের গঠন দেখিলে মনে হয় যে, এই জন্তু সাঁতরাইতে খুব পটু ছিল।

এই-সকল জন্তুর চিহ্ন অনেক সময় এরূপ স্থানে এবং এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় তাহরা কাদায় ডুবিয়া মারা পড়িয়াছিল। খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদির ধারে অনেক সময় ভয়ানক কাদা থাকে, সেই কাদায় পড়িয়া কত জন্তু এখনো মারা যাইতেছে। জলের গাছপালার ঠাণ্ডা রসাল ডগাগুলি অনেক জন্তুরই খুব প্রিয় বস্তু। বিশেষত সেই জল যদি লোনা হয়, তবে তাহার ধারের পাঁক চাটিয়া নিরামিষভোজী জন্তুরা যার পর নাই সুখ পায়। এমন সরেস জিনিস পাইলে কি একটু খাইয়াই চলিয়া আসা যায়! যতক্ষণ পেটে স্থান থাকে, ততক্ষণ বসিয়া তাহা খাইতে হয়। এদিকে পাঁকের ভিতরে পা ঢুকিয়া যাইতেছে, তাহার খবর নাই। ব্রণ্টোসোরসের মতন লম্বা গলা থাকিলে একস্থানে বসিয়াই অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাইবার সুবিধা হয়; আর ততক্ষণে তাহার পা হয়ত এতটা বসিয়া যায় যে, খাওয়া শেষ হইলে আর চলিয়া আসিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং সেইখানেই তাহার জীবনের শেষ হয়।

আজকালকার কুমিরদের ডিম হয়। ব্রন্টোসোরসের ডিম হইলে, তাহার এক-একটা না জানি কত বড় হইত! কিন্তু ডাইনোসরেরা ডিম পাড়িত কি না সে বিষয়ে পণ্ডিতদের সন্দেহ আছে।

অনেক বড়-বড় ডাইনোসর সেকালে ছিল, কিন্তু তাহাদের সকলের কথা লিখিবার স্থান এই পুস্তকে নাই। এই সকল ডাইনোসর অনেক সময় খুব বড়-বড় হইত বটে, কিন্তু তাহারা সাধারণত নিরামিষভোজী সাদাসিধে জন্তু ছিল।

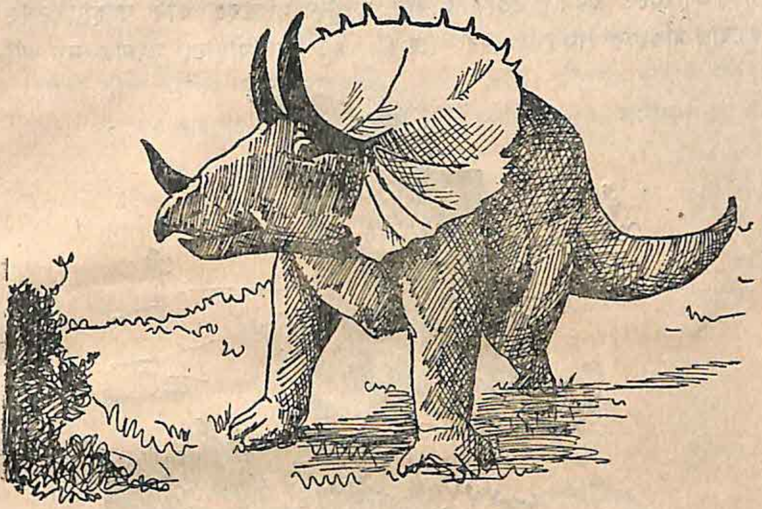
মাংসখেকো ডাইনোসরগুলি এর চাইতে ছোট ছিল। তাই বলিয়া তাহারা নিতান্তই অবহেলার পাত্র ছিল, এমন ভাবিও না। আজকালকার বাঘ ভাল্লুক-গুলিকে কি তোমরা একটুও হিসাব কর না? লেজসুদ্ধ বার ফুট লম্বা বাঘ অতি অল্পই আছে। কিন্তু এক-একটা মাংসখেকো ডাইনোসর ত্রিশ ফুট লম্বা হইত! বাঘ হাতির সমান বড় হইলে, তবে এইরূপ একটা জন্তুর সঙ্গে তুলনা হয়।

একটা মাংসভোজী ডাইনোসরের নাম 'মিগালোসোরস্' (ভীষণ কুম্ভীর)। ইহার চেহারা দেখিলে আজকালকার ক্যাঙারুগুলির কথা মনে হয়। ইহাদের পিছনের পায়ের হাড়গুলির গঠন অনেকটা উটপাখির হাড়ের গঠনের মতন। পিছনের দুই পায় ভর করিয়াই সচরাচর চলিত, চলিবার সময় সামনের পা বেশি ব্যবহার করিত না। কুমিরের দাঁত কেমন ভয়ানক তাহা সকলেই দেখিয়াছি। মিগালোসোরসের ইহার চাইতেও ভয়ানক করাতের মতন দাঁত, এবং এর উপর আবার ভয়ানক ধারালো নখ ছিল। লাফাইবার আর ছুটিবার ক্ষমতাও অসাধারণ। সে সময়ে বাঘ ভাল্লুক ছিল না; তাহার বদলে ইহারাই ছিল।

ডাইনোসর খুব প্রকাণ্ড ছিল, ভয়ানকও ছিল; আবার এক-একটা নিতান্ত অদ্ভুতও ছিল। একটা ডাইনোসর ছিল, তাহাকে এখন পণ্ডিতেরা 'ইগুয়া-নোডন্' (অর্থাৎ ইগুয়ানার মতন দাঁত যার—ইগুয়ানা একরকম গোসাপ) বলিয়া থাকেন। প্রথমে এই জন্তুর দাঁত পাওয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তখনকার সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত কুভিয়ে বলিলেন, 'এটা হিপোপটেমাসের দাঁত।' কিছুদিন পরে ঐ জন্তুর সামনের পায়ের বুড়ো আঙুলের একটা নখ পাওয়া গেল। তাহা দেখিয়া কুভিয়ে বলিলেন, 'এটা গণ্ডারের শিং।' তোমরা হাসিও না। কুভিয়ে যেমন-তেমন পণ্ডিত ছিলেন না। যে 'কম্পারেটিভ অ্যানাটমি' শাস্ত্রের গুণে আজ সেকালের জন্তুদের সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এত কথা জানিতে পারিয়াছেন, আর আমি তাহা পড়িয়া তোমাদিগকে ডাকিয়া এতগুলি আশ্চর্য কথা শুনাইতে বসিয়াছি—কুভিয়ে সেই 'কম্পারেটিভ-অ্যানাটমি' শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। কুভিয়ের ভুল হইয়াছিল, ইহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, জন্তুটার গঠন নিতান্তই অদ্ভুত ছিল।

ইগুয়ানোডনের দাঁতের বিষয়টা শীঘ্রই পরিষ্কার হইল; কিন্তু তাহার ঐ 'গণ্ডারের শিং-এর' মতন হাড়খানার অর্থ বুঝিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল।

আমরা ছেলেবেলায় ইগুয়ানোডনের যে-সকল ছবি দেখিতাম, তাহাতে উহার নাকের উপর কতকটা গণ্ডারের শিং-এর মতন একটি ছোট শিং থাকিত। শেষে ঐ জন্তর আরো অনেক হাড় পাওয়া গেলে পরে জানা গিয়াছে যে, উহা তাহার শিং নহে, হাতের বুড়ো আঙুলের নখ। এই জন্তু নিরামিষ খাইত।



ট্রাইসিরেটপ্স

তিন শিংওয়ালা নিরামিষভোজী ডাইনোসর। ২৫ ফুট লম্বা ছিল।

ইগুয়ানোডনের শিং ছিল না বটে, কিন্তু শিংওয়ালা ডাইনোসর সেকালে বিস্তর তিল। এইরূপ একটা মাংসাশী জন্তর নাম কিরাটোসোরস্ (শৃঙ্গী কুম্ভীর)। এই জন্তু প্রায় মিগালোসোরসের সমান বড়, আর ইহার নখ দাঁতও তেমনি ভয়ানক। ইহার নাকের উপর আবার গণ্ডারের শিং-এর মতন একটা ভয়ানক শিং।

আর একটার নাম ট্রাইসিরেটপ্স (ত্রিশৃঙ্গানন, অর্থাৎ তিন শিংওয়ালা মুখ যার)। ইহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন বেচারার গণ্ডার হইতে ভারি সাধ হইয়াছিল, আর তাহার জন্য সে বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিল—পারিয়াছিল কি না, পাঠক-পাঠিকারা বলিবেন। যদি না পারিয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ দুঃখের কারণ দেখি না। গণ্ডারের এক শিং, ইহার তিন শিং। গায়ের চামড়াটি গণ্ডারের চামড়ার চাইতেও উঁচুদরের। ইহার উপর আবার গলায় হাঁসুলি! তোমরা হয়ত বলিবে 'গোদের উপর বিষফোড়া'। ইহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে বিষফোড়াটা দেখিতেছি গোদের চাইতেও বড় হইয়া গেল! লম্বায় এই জন্তু প্রায় পঁচিশ ফুট হইত। সুতরাং এ বিষয়ে ও গণ্ডারের জ্যাঠামহাশয়।

এরপর যাহার ছবি দেওয়া যাইতেছে তাহার নাম 'ষ্টিগোসোরস্' (চাল

কুমির)। ইহার পিঠ দেখিলে খড়ো ঘরের চালের কথা মনে হয়, তাই এই নাম হইয়াছে। এই জন্তু প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা হইত।

ষ্টিগোসোরসের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য একটা কথা আছে। এই জন্তুর কোমরের নীচে এমন একটা স্থান আছে যে, তাহা দেখিলে মনে হয়, উহার ঐ স্থানেও মস্তিষ্ক ছিল। একটা জন্তুর দুইটা মস্তিষ্ক, এ কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ইহার মাথায় যতটুকু মস্তিষ্কের স্থান তাহার দশগুণ বেশি মস্তিষ্কের স্থান কোমরের কাছে। এত মগজ যাহার, তাহার না জানি



ষ্টিগোসোরস্‌

২৫ ফুট লম্বা নিরামিষখেকো ডাইনোসর। ইহার দুইটি মস্তিষ্ক ছিল

কতটা বুদ্ধি ছিল! মাঝে মাঝে এক-একটা দশ বার বছরের ছেলে দেখিতে পাই—সে চুরুট খাইতে শিখিয়াছে, আর ইহারই মধ্যে এত জিনিসের খবর লইয়াছে যে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। তখন আমার এই ষ্টিগোসোরসের কথা মনে পড়ে, আর একটিবার সেই ছেলের কোমরের দিকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, ওখানেও একটা বুদ্ধির ঝুলি আছে কি না! তোমরা তাহাকে দেখিলে হয়ত বলিবে 'জ্যাঠা'। কিন্তু আমার মতে ইহাকে 'চাল কুমির' বলিলে অধিক সঙ্গত হয়।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কুমির গোসাপ ইত্যাদি জাতীয় জন্তু হইতেই পাখির উৎপত্তি, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইকৃথিয়োসোরস্‌, প্লীসিয়োসোরস্‌

প্রভৃতির ভিতরে পাখির কোন লক্ষণ ছিল না। তারপর ডাইনোসরগুলির ভিতরে পাখির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। ইহাদের কোমরের হাড়, পিছনের পা প্রভৃতি পাখির মতন ছিল ; ইহাদের পায়ের দাগ দেখিলে পাখির পায়ের দাগ বলিয়া ভ্রম হয়।

ঠোঁটওয়ালা ডাইনোসর, ইকৃথিয়োসোরস্ ও প্লীসিয়োসোরসের সময় হইতেই ছিল। ইহাদের ঠোঁট পাখির ঠোঁটের মতনই ছিল, তাহার উপর আবার অনেক সময় ইহাদের দাঁতও থাকিত। ইহাদের অনেকেই উড়িতে পারিত। কিন্তু তাহাদের পাখা পাখির পাখার মতন ছিল না ; কতকটা বাদুড়ের পাখার মতন ছিল। ইহাদের সাধারণ নাম টেরোড্যাক্টাইল (অঙ্গুলি পক্ষ)। আজকাল যেমন



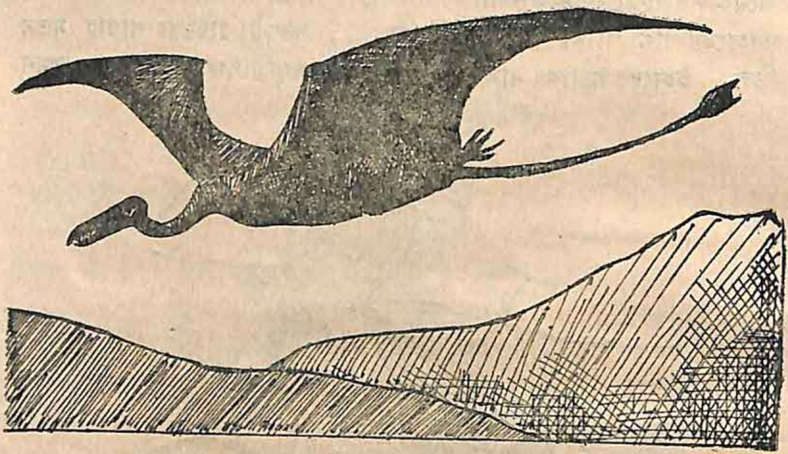
আর্কিঅপ্টেরিক্সের হাড়

ছোট-বড় নানাপ্রকার পাখি আছে, তেমনি ইহারাও নানারকমের হইত। কোন-কোনটা চড়াই পাখির মতন ছোট ছিল ; আবার কোনো-কোনটা ডানা মেলিলে ২৫ ফুট জায়গা ঢাকিয়া ফেলিত। খুব বড়গুলির দাঁত ছিল না। ইহাদের কোনটার লম্বা লেজ ছিল, আবার কোনটার লেজ প্রায় ছিল না বলিলেই হয়।

রামফোরিংকস বলিয়া একরকম ছোট টেরোড্যাক্টাইল ছিল। ইহার লেজটি বেশ লম্বা ; তাহার আগার গড়ন কতকটা গাছের পাতার মতন। খুব লম্বা

বোঁটার আগায় একটা ছোট পাতা থাকিলে যেমন দেখায়, রামফোরিংকসের লেজ অনেকটা সেইরূপ ছিল। উড়িবার সময় এই লেজ দিয়া হালের কাজ চলিত। রামফোরিংকসের লেজের কথা ভাবিলে পাখির পালকের কথা মনে হয়।

লিথোগ্রাফারেরা যে পাথরের উপর ছবি আঁকে, জার্মানি দেশে ঐরূপ পাথরের খনিতে রামফোরিংকসের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঐ জাতীয় পাথরের খনিতে কাজ করিবার সময় মাঝে-মাঝে দু-একটি পাখির পালকও দেখিতে



রাম্‌ফোরিংকস

পাওয়া যাইত। শেষে একবার একটা পাখির অনেকগুলি হাড় ও পালক পাওয়া গেল। এই-সকল চিহ্ন ঠিক যেরূপ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাহার ছবি দেওয়া যাইতেছে। ইহাই পৃথিবীর প্রথম পক্ষী। যে স্থানে এই-সকল চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, তাহার নাম সোলেনহফেন। এইজন্য অনেক সময় ইহাকে 'সোলেনহফেনের পাখি' বলা হয়। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক নাম আর্কিঅপ্টেরিক্স্ (পুরাতন পাখি)।

এই চিহ্নগুলি দেখিলে পাখি ভিন্ন অন্য কোন জন্তুর চিহ্ন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে কর যে এটা ঠিক আজকালকার পাখির মতন ছিল, তবে বড় ভুল হইবে। ছবিখানিকে একবার ভাল করিয়া দেখ। ইহাতে এই পাখির লেজটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এ লেজ ত ঠিক পাখির লেজের মতন নয়! পালকগুলি পাখির পালকের মতন, তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু আসল লেজটি যে গোসাপের, তাহা হাড় কয়খানি দেখিলেই বুঝা যায়। গোসাপের লেজে জোড়া জোড়া করিয়া পালক পরাইয়া এই অদ্ভুত জন্তুর লেজ তৈয়ার হইয়াছে।

মাথায় কতকটা পাখির মতন ঠোঁট আছে, আবার কুমিরের মতন দাঁতও আছে। ডানা দু-খানি হঠাৎ দেখিলে পাখির ডানা বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু

একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহা ঠিক আজকালকার পাখির ডানা নহে। এখন আমরা কোন পাখির ডানায় আঙুল দেখিতে পাই না, (অর্থাৎ বাহির হইতে দেখিতে পাই না। পালকের ভিতরে খুঁজিয়া দেখিলে এখনো কোন পাখির ছোট ছোট আঙুল দেখিতে পাওয়া যায়।) কিন্তু এই আশ্চর্য পাখির প্রত্যেক ডানায় তিনটি করিয়া আঙুল। শরীরের হাড়গুলি কতক পাখির মতন, কতক গোসাপের মতন। এই পাখি কাকের মতন বড় হইত।

আজকাল কোন পাখির মুখে দাঁত দেখা যায় না, কিন্তু সেকালের অনেক পাখির মুখে দাঁত ছিল। এই-সকল দাঁতওয়ালা পাখির চিহ্ন আমেরিকায় পাওয়া গিয়াছে, একটার নাম 'হেস্পারনিস' অর্থাৎ পশ্চিমের পাখি। আমেরিকা ইউরোপের পশ্চিমে, সুতরাং সেখানে যে পাখি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম পশ্চিমের পাখি। এই পাখি অনেকটা পেংগুইন পাখির মতন ছিল। ইহার উড়িবার ক্ষমতা ছিল না ; জলে সাঁতরাইয়া বেড়াইত। এইরূপ আর-একটা পাখির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম 'ইক্‌থিয়র্নিস' অর্থাৎ মাছ-পাখি। ইহার মেরুদণ্ডের হাড়গুলি মাছের হাড়ের মতন ছিল, তাই ওরূপ নাম হইয়াছে!

বাস্তবিক সেকালের জন্তুগুলির ভিতরে মাছ, কুমির, পাখি ইত্যাদিতে



হেস্পারনিস ইক্‌থিয়র্নিস
সেকালের পাখি

কেমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছিল। একটাকে ধরিয়া খাইতে পারিলে অনেকপ্রকারের জন্তু খাওয়ার ফল হইত। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে তেমন আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আজকাল ওরূপ জন্তু দু-একটা বাঁচিয়া থাকিলে

আমরা উহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই আশ্চর্য মনে করিতাম না। এখন নাকি ওরূপ কিছু নাই, তাই এগুলি এত অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জন্তুর কথা বলিতে গিয়া সময়ের কথা কতকটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ডাইনোসর সবগুলি যে পৃথিবীতে ঠিক একই সময়ে দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে। যাহাদের কথা আগে বলিয়াছি তাহারাই যে আগে ছিল, আর যাহাদের কথা পরে বলিয়াছি তাহাদের সকলেই যে পরে আসিয়াছিল, তাহাও নহে। টেরোড্যাক্টাইলগুলি, ইক্‌থিয়োসোরস্ প্রভৃতির সময় হইতেই ছিল। ইগুয়ানোডন প্রভৃতি টেরোড্যাক্টাইল ও আর্কিঅপ্টেরিক্সের পরে জন্মিয়াছিল। আবার, প্লীসিয়োসোরস্‌গুলি প্রায় ইগুয়ানোডন প্রভৃতির সময় পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। শুধু যে বাঁচিয়াছিল তাহা নহে, শেষকালের প্লীসিয়োসোরস্‌গুলিই বেশি বড় হইত।

যে-সকল ডাইনোসরের কথা বলিয়াছি, তাহা ছাড়াও ছোট বড় অনেক ডাইনোসর ছিল। আট্‌লাণ্টোসোরস্ আশি নব্বই ফুট লম্বা হইত। ডিপ্লোডোকস্ নামক আর একটা ডাইনোসর প্রায় ৫০ ফুট ছিল।

ডাইনোসরেরা উভচর ছিল ; অর্থাৎ তাহারা জলেও থাকিতে পারিত আর ডাঙায়ও থাকিতে পারিত। তবে অধিক সময় যে তাহারা ডাঙাতেই কাটাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাইনোসর ছাড়া অনেক কুম্ভীর-জাতীয় জলচর জন্তুও তখন ছিল। ইহাদের দস্তুরমতন পা ছিল না, ইক্‌থিয়োসোরস্ প্লীসিয়োসোরসের মতন ডানা হইত। এই-সকল জন্তুর অনেকগুলি খুব সরু আর খুব লম্বা—দেখিতে সাপের মতন ছিল। ইহাদের মধ্যে মোসাসোরস্ প্রায় আশি ফুট লম্বা হইত। ইলাস্‌মোসোরস্ ৫০ ফুট ছিল।

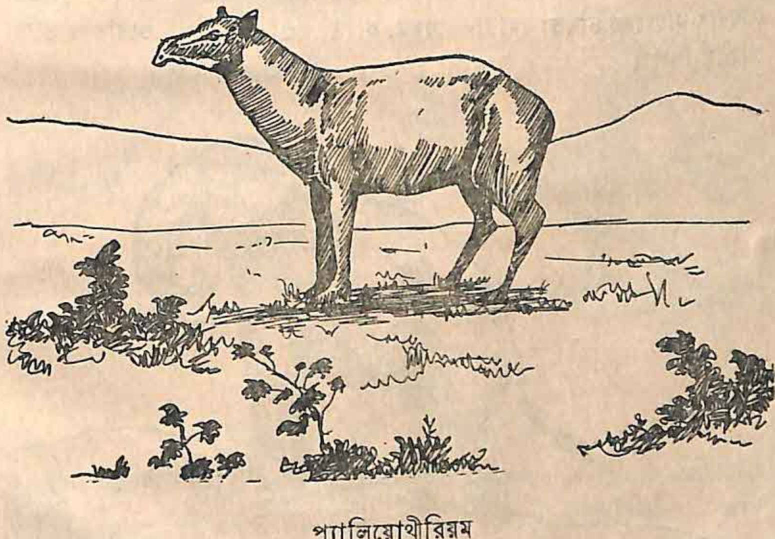
এ কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে এতদিনে পৃথিবীর বয়স ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। এই সময়ে পৃথিবীর অবস্থা অনেকটা এখনকার গরম দেশ-গুলির মতন ছিল। মেরুর কাছে স্থানগুলি তখন এত ঠাণ্ডা ছিল না ; সেখানে এত বরফও ছিল না। গ্রীনল্যাণ্ডে তখন আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গাছপালার ন্যায় গাছপালা বিস্তর জন্মিত। আজকালকার বড়-বড় গাছের মতন অনেক গাছ ছিল। তাল নারিকেল জাতীয় গাছেরও অভাব ছিল না।

এই সময়েই পৃথিবীতে খড়ির উৎপত্তি হয়। তোমরা যে খড়ি দিয়া বোর্ডে লেখ, দাঁত পরিষ্কার কর, সেই খড়ি অসংখ্য শামুক ঝিনুকের খোলা পচিয়া এই সময়েই জন্মিয়াছিল। এখনো সমুদ্রের তলায় অনেক স্থানে এইরূপ জিনিস জন্মিতেছে ; তাহা যে কালে খড়ি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বেই স্তন্যপায়ী জন্তু দেখা দিয়াছিল। প্রথম স্তন্যপায়ী জন্তু বেশি বড় ছিল না—বড়জোর বিড়ালটার মতন হইবে। এই-সকল জন্তু ক্যাঙারু, অপোসম্ ইত্যাদির জাতীয়। এইরূপ দুটি জন্তুর নাম 'আম্‌ফিথীরিয়ম' আর 'ফাস্কলোথীরিয়ম'।

আমাদের এই পৃথিবী আগে খুব গরম ছিল; তারপর ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া তাহার বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। পৃথিবীর ভিতরটা এখনো যে খুব গরম আছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে, সেই গরম স্থানটা অনেকখানি মাটির নীচে থাকায়, আমরা সহজে তাহা বুঝিতে পারি না। পৃথিবীর উপরকার খোলাটা এখন বেশ পুরু হইয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া ভিতরকার গরম সহজে বাহিরে পৌছাইতে পারে না।

পৃথিবীর খোলা যখন এত পুরু ছিল না, তখন তাহার ভিতরকার আগুনের তেজে তাহার বাহির অবধি বেশ গরম থাকিত। তখনকার পৃথিবী এখনকার পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গরম ছিল; আর সেই গরমটা পৃথিবীর সর্বত্রই সমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর খোলা সকল স্থানেই সমান পুরু, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া সকল স্থানেই সমান পরিমাণ উত্তাপ বাহিরে আসিত। সূর্যের তখন পৃথিবীর উপরে এতটা প্রভুত্ব ছিল কি না সন্দেহ। তখন এত গরম ছিল বলিয়া আজকালকার চাইতে সে সময়ে অনেক বেশি জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং



প্যালিয়োথীরিয়ম
টেপির জাতীয় নিরামিষভোজী সেকালের জন্তু

আকাশ তখন খুব মেঘলা ছিল। সেই মেঘের ভিতর দিয়া সূর্যের তেজ অধিক পরিমাণে পৃথিবীতে পৌছিতে পারিত না।

সে সময়ে আর এ সময়ে একটা মস্ত প্রভেদ তবে এই দেখা যাইতেছে যে, তখন পৃথিবী নিজের তেজেই গরম ছিল, আর এখন সূর্যের তেজটুকু না হইলেই সে শীতে কষ্ট পায়। এখন যে শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্তন হয় তাহার কারণ ঐ সূর্য। সেকালের প্রথম এবং মধ্য অবস্থায় পৃথিবীর

উপরে সূর্যের প্রাধান্য খুবই কম ছিল; সুতরাং আজকালকার ন্যায় এরূপ শীত গ্রীষ্মের পরিবর্তন হইত না। তখন বার মাসই গ্রীষ্মকাল; আকাশ মেঘলা; জমি স্যাঁৎসেতে। মেরুর কাছেও তখন এত বরফ ছিল না। গরম দেশের গাছপালা তখন মেরুতেও জন্মিত।

সেকালের কথা বলিতে বলিতে আমরা এখন এমন একটা সময়ে আসিয়াছি যে, তখন পৃথিবীর নিজের তেজ কমিয়া গিয়া কতকটা আজকালকার মতন অবস্থা হইয়াছে। শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। আজকালকার মতন গাছপালা আর জন্তু ক্রমে অধিক পরিমাণে দেখা দিতেছে। ইহাই সেকালের শেষ অবস্থা। এখন হইতে স্তন্যপায়ী জন্তুর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষে মনুষ্যের জন্ম হয়। যখন মানুষ আসিল, তখন আর 'সেকাল' রহিল না—তখন 'একালের' আরম্ভ হইল। সেকালের এই অবশিষ্ট অংশটুকুর কথা শেষ হইলেই এবারকার মতন পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ছুটি চাহিতে পারি।

প্রথম স্তন্যপায়ী জন্তুগুলি খুব ছোট ছোট ছিল। তাহাদের কথা ইতিপুর্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। সেকালের বড় বড় স্তন্যপায়ী জন্তুগুলি প্রায়ই স্থূলচর্মী (অর্থাৎ যাহাদের চামড়া মোটা—যেমন, হাতি, গণ্ডার, টেপির, শুয়োর প্রভৃতি) জাতীয় ছিল।



ডাইনোথীরিম

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হস্তী

এই জাতীয় যে জন্তুটির হাড় প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, তাহার নাম প্যালিয়োথীরিয়ম, অর্থাৎ পুরাতন জন্তু। এই জন্তু দেখিতে অনেকটা

টেপিরের মতন ছিল। নিরামিষখেকো নিরীহ ভালমানুষ জন্তু। কাহারো কোন অনিষ্ট করিত না। অনেকগুলি একত্রে দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসিত।

ইহার কিছুকাল পরে পৃথিবীতে নানা জাতীয় হাতি দেখা দিল। পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই-সকল হাতির চিহ্ন পাওয়া যায়। ইহাদের অনেক গুলি আমাদের আজকালকার হাতির চাইতে বড় হইত।

প্রথমে যে হস্তীজাতীয় জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, পণ্ডিতেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন ডাইনোথীরিয়ম, অর্থাৎ ভয়ানক জন্তু। ছবিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অন্তত চেহারায় জন্তুটা নিতান্তই ভয়ানক। এত বড় স্থলচর জন্তু পৃথিবীতে বেশি হয় নাই। এই জন্তুর একটা মাথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় তিন হাত লম্বা, আর দুই হাতেরও বেশি চওড়া। ইহার দাঁত দুটা কেমন অদ্ভুত ছিল দেখ। এরকম দাঁত দিয়া উহার কি কাজ হইত বলা কঠিন। উহা দ্বারা গুঁতাইবার সুবিধা খুব কমই দেখা যাইতেছে। তবে, গাছের পাতা খাইবার সময় শুঁড় দিয়া বড়-বড় ডাল বাঁকাইয়া ঐ দাঁতের দ্বারা



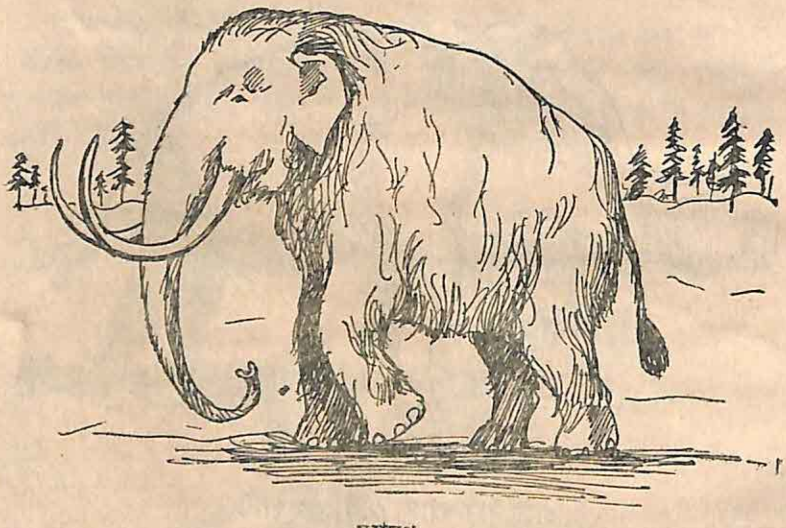
ম্যাস্টোডন
চারি দাঁতওয়ালা সেকালের হাতি

তাহা আটকাইয়া রাখার সুবিধাটা বেশ ছিল বোধ হয়। তাহা ছাড়া এখনকার মহিষগুলির ন্যায় এই জন্তুও হয়ত জলে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসিত। ওরূপ অবস্থায় ঘুম পাইলে দাঁতগুলিকে কোন জিনিসে আটকাইয়া নিদ্রা যাওয়া মন্দ ছিল না। নহিলে স্রোতে ভাসাইয়া নেওয়া আশ্চর্য কি? যাহা হউক নামটি এবং চেহারাটি ভয়ানক হইলেও ইহার স্বভাব হিংস্র ছিল না। গাছ-পালাই ইহার একমাত্র আহার ছিল।

ম্যাস্টোডন নামক আর আর-এক প্রকারের জন্তু ছিল, তাহার চেহারা অনেকটা হাতিরই মতন। কিন্তু তাহার শরীরের গঠন একটু লম্বাটে ধরনের, আর পাগুলি মোটা-মোটা ছিল। আজকালকার হাতির দুইটা দাঁত, কিন্তু

অনেক ম্যাস্টোডনের চারিটা দাঁত হইত। দুটা উপরে, দুটা নীচে। জন্তুটি বৃদ্ধ হইলে অনেক সময় তাহার নীচের দাঁত দুটা পড়িয়া যাইত।

আমেরিকায় বিস্তর ম্যাস্টোডন ছিল। এখনো সেখানকার একজাতীয় অসভ্য লোকদিগের মধ্যে এমন সব গল্প চলিত আছে যে, তাহা শুনিলে বোধ হয়, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা ম্যাস্টোডন দেখিয়াছে। ম্যাস্টোডনের হাড়কে তাহারা বলে, 'ষাঁড়ের বাপের হাড়।' তাহাদের বিশ্বাস যে, 'ষাঁড়ের বাপটা' একটা ভারি ভয়ঙ্কর জন্তু ছিল; আর তখন পৃথিবীতে তেমনি বড় বড় মানুষও ছিল। মহাপুরুষ তাঁহার বজ্র দিয়া তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলেন। একদল ষাঁড়ের বাপ জুটিয়া মানুষেরা পোষা হরিণ, মহিষ ইত্যাদি জন্তুকে মারিয়া ফেলিতেছিল। মহাপুরুষ তাঁহার বজ্র দিয়া তাহাদের আর সকলকেই মারিয়া ফেলিলেন, খালি পালের গোদাটাকে মারিতে পারিলেন না। সে তাঁহার বজ্র ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। শেষে পাঁজরে বজ্রের ঘা খাইয়া বড় বড় হ্রদের দিকে পলাইয়া গেল। সেখানে সে আজও আছে।



ম্যামথ্

লোমওয়ালা সেকালের হাতি। এই হাতি মানুষের সময় পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল।

আর-এক রকমের হাতি ছিল, তাহার নাম ম্যামথ্। ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেক স্থানে ম্যামথের দাঁত এবং হাড় পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই-সকল দাঁত কুড়াইয়া এখনো অনেক লোকে ব্যবসায় চালাইতেছে। ম্যামথ্ হাতির মত বড় হইত। সাইবেরিয়ায় এখনো অনেক ম্যামথের দেহ পাওয়া যায়। জন্তু মরিবার সময় বরফ চাপা পড়িলে, যতদিন না সেই বরফ গলিয়া যায় ততদিন সেই জন্তু পচে না। সাইবেরিয়ায় শীত খুব বেশি। সেখানে এত বরফ পড়ে যে, অনেক স্থলেই সেই প্রাচীনকাল হইতে তিন চারিশত ফুট উঁচু হইয়া

বরফ পড়িয়া আছে, আজও তাহা গলে নাই। এইসকল বরফের মধ্যে অনেক সময় মরা ম্যামথ্ পাওয়া যায়। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে যে ম্যামথ্ (হয়ত বরফ চাপা পড়িয়া) মরিয়াছিল, তাহা একটুও পচে নাই, এমনও দু-এক স্থলে দেখা গিয়াছে।

বেঙ্কেন্‌ওর্ফ নামক রুশিয়া দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার ১৮৪৬ সালে ইন্দিগার্কা নদীতে এইরূপ একটা ম্যামথ্ পাইয়াছিলেন। এই ম্যামথ্‌টা ১৩ ফুট উঁচু আর ১৫ ফুট লম্বা ছিল। এক-একটা দাঁত ৮ ফুট লম্বা, শুঁড় ৬ ফুট লম্বা। লেজ আর কানে লোম নাই, তাহা ছাড়া সমস্ত শরীরে লোম। পিঠে আর কাঁধে এক ফুট লম্বা মোটা মোটা কেশরের মতন লোম। সেই মোটা লোমের নীচে খুব ঘন মোলায়েম পশম। লেজের আগায় এক-গোছা লোম ছিল। জন্তুটার চেহারাটা দেখিতে বড়ই বিকট। হাতির চেহারা তাহার কাছে কিছুই নয়।

মরিবার পূর্বে এই ম্যামথ্‌টা ডালপালা দিয়া জলযোগ করিয়াছিল। এতদিন পরে তাহার পেট চিরিয়া সেই সমস্ত ডালপালা পাওয়া গেল। তাহার অধিকাংশই একপ্রকার ঝাউগাছের ডাল ও পাতা। সেরকম গাছ আজও ঐ-সকল স্থানে জন্মায়।

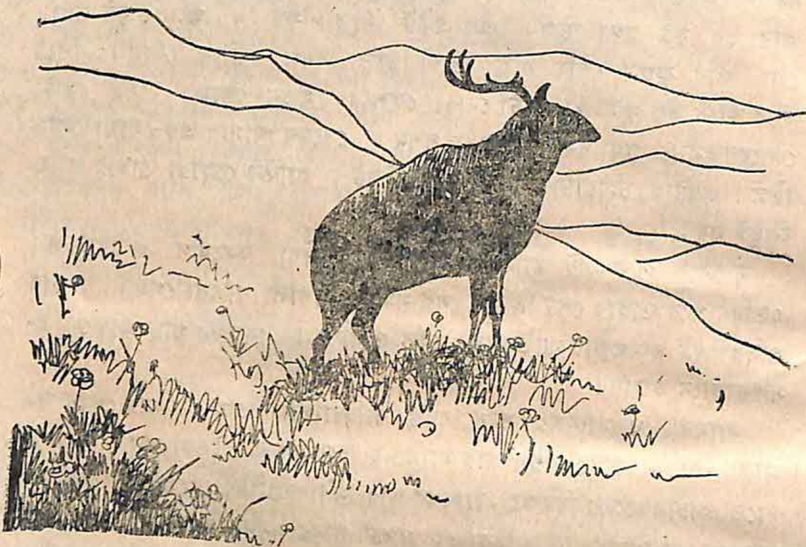
ম্যামথ্ যে মানুষের সময় পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। প্রাচীনকালের মানুষ আর ম্যামথের চিহ্ন একত্রে পাওয়া যায়। ম্যামথের দাঁতে প্রাচীনকালের চিত্রকর ম্যামথের ছবি আঁকিয়াছিল ; সেই ছবিসুদ্ধ সেই দাঁত পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই আশ্চর্য ছবির নমুনা দিলাম। ইহা অপেক্ষা পুরাতন ছবি পৃথিবীতে নাই। তখনকার মানুষ ধাতুর জিনিস প্রস্তুত করিতে জানিত না ; পাথরের কুচি দিয়া অস্ত্রের কাজ চালাইত। বোধ হয় ঐ পাথরের কুচির আঁচড় দিয়াই এই ছবিটি আঁকিয়াছিল। এমত অবস্থায় ছবিটি এমন মন্দই বা কি হইয়াছে! আর, ভাল হউক আর মন্দ হউক, উহা ত ম্যামথেরই চেহারা। চিত্রকর ম্যামথ্ না দেখিয়া কখনই তাহা আঁকিতে পারে নাই, এ কথা নিশ্চয়।

আমাদের দেশে অনেকপ্রকারের হাতি ছিল, তাহার একটির নাম টিগোডন্ গণেশ। এই হাতির একটি মাথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দাঁতসুদ্ধ চৌদ্দ ফুট লম্বা। এক-একটি দাঁত সাড়ে দশ ফুট লম্বা।

আর-একটি জন্তু আমাদের দেশে ছিল, তাহার নাম শিবথীরিয়ম্ (শিবের জন্তু)। এই জন্তু হরিণ আর জিরাফের মাঝামাঝি। ইহার চারিটি শিং ছিল। আকৃতি গণ্ডার অপেক্ষাও বড়।

আমাদের দেশে একপ্রকারের অতি বৃহৎ কচ্ছপ ছিল ; তাহার একটা খোলা তোমাদের অনেকেই কলিকাতার জাদুঘরে দেখিয়া থাকিবে। এই খোলা দশ ফুট লম্বা, আর তাহার উপযুক্ত-রূপ উঁচু এবং চওড়া। ইহার ভিতরে তিন-চারিজন লোক অনায়াসে ঢুকিয়া থাকিতে পারে। পুরাতন ভ্রমণ-বৃত্তান্তের

পুস্তকে এমন একটা দেশের উল্লেখ দেখা যায় যে, সেখানকার লোকেরা এক-একখানা আস্ত কচ্ছপের খোলা দিয়া ঘরের চাল প্রস্তুত করিত। এ-সকল গল্প সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু জাদুঘরের ঐ কচ্ছপের খোলাটা দিয়া সন্ন্যাসী-গোছের একজন লোক থাকিবার মতন একটা ঘরের চাল অনায়াসে হইতে পারে।



শিবথীরিয়ম্
গণ্ডার অপেক্ষাও বৃহৎ হিমালয়বাসী সেকালের জন্তু

দেরাদুনের নিকট শিবলিক পর্বতে এই-সকল জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়াছে। নর্মদা নদীর ধারেও অনেক জন্তুর হাড় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় শ্লথ্ জাতীয় কয়েকটি জন্তুর হাড় পাওয়া যায়।

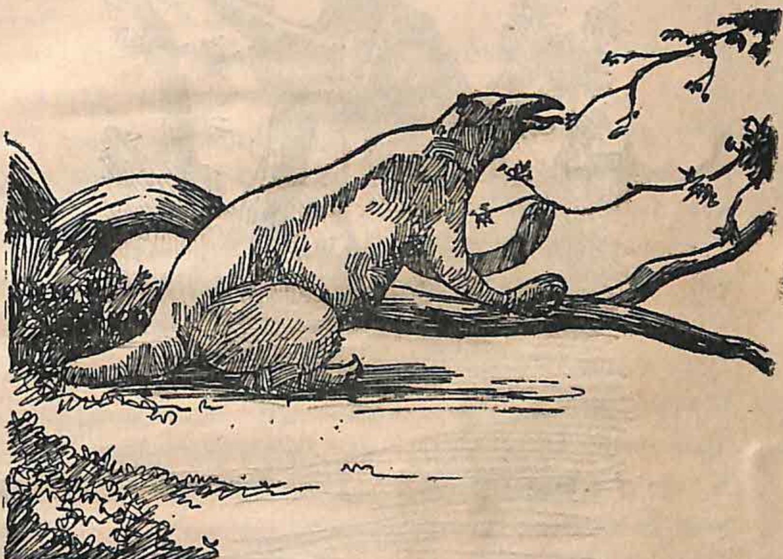
দক্ষিণ আমেরিকায় শ্লথ্ জাতীয় কয়েকটি জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুটির নাম মিগাথীরিয়ম্ আর মাইলোডন্। মিগাথীরিয়ম্ শব্দের অর্থ ভয়ঙ্কর জন্তু। এই জন্তু হাতির সমান বড় হইত। লম্বায় প্রায় আঠার ফুট।

ইহার পিছনের পা, লেজ এবং কোমরের হাড় হাতির হাড়ের চাইতেও বড় আর মজবুত। ঐ-সকল অঙ্গে যে উহার কত জোর ছিল, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই জন্তু গাছের পাতা খাইত। কিন্তু এত বড় জন্তুর গাছে উঠিয়া পাতা সংগ্রহ সম্ভব নহে, কাজেই সে গাছ ভাঙিয়া গাছ মারিত। বাস্তবিক এমন প্রকাণ্ড আর ষণ্ডা একটা জন্তুতে ধরিয়া টানা-

টানি করিলে, বড় বড় গাছও ভাঙিয়া যাইবার কথা। এই জন্তুর একটা কঙ্কাল জাদুঘরে আছে।

মাইলোডন্ মিগাথীরিয়ম্ অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, মাইলোডন্ নাকি আজও জীবিত আছে। এমন-কি, একদল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইহার অনুসন্ধানে পাটাগোনিয়া দেশে গিয়াছেন। তাঁহাদের খুব আশা আছে, সেখানকার বনে অনুসন্ধান করিয়া ইহাদের দু-একটাকে ধরিয়া আনিতে পারিবেন। মাইলোডন্ শব্দের অর্থ 'জাঁতার মত দাঁত'।

নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপে মোয়া নামক একপ্রকার পক্ষীর হাড় পাওয়া যায়। এই পাখি প্রায় বার-তের ফুট উঁচু হইত। দেখিতে অনেকটা উটপাখির মতন



মিগাথীরিয়ম্
শ্লথ্ জাতীয় সেকালের জন্তু। হাতী অপেক্ষাও
বড় এবং বলবান ছিল

ছিল। পাখা না থাকায় উড়িবার ক্ষমতা ছিল না; লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। এই পাখি খুব অল্পদিন হইল লোপ পাইয়াছে। এমন কি, কোন-কোন প্রাচীন ভ্রমণকারী বলেন যে, তাঁহারা উহা দেখিয়াছেন। কিন্তু আজকাল অনেক খুঁজিয়াও জীবন্ত মোয়া কেহ দেখিতে পায় না। মাদাগাস্কার দ্বীপে ইপিঅর্নিস নামক একপ্রকার পাখির হাড় আর ডিম পাওয়া যায়। এ পাখিটাও মোয়ার মতনই বড় ছিল। ইহার একটি ডিম মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা। তাহার ভিতরে প্রায় দেড়শত মুরগির ডিমের সমান জিনিস ধরিত।

সেকালের জন্তু সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয় নাই। সে-সকল কথা তোমরা বড় হইয়া পড়িবে। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, পৃথিবীটা বুঝি খালি আমাদের জন্যই হইয়াছিল। আশা করি এতক্ষণে আমাদের এই ভুলটা একটু শোধরাইতে চলিয়াছে। জলে বুড়বুড়ি উঠে, আবার তখনই তাহা জলে মিশিয়া যায়। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্যন্ত জন্তুসকল এইরূপ ভাবেই



মাইলোডন্
মিগাথীরিয়মের অনুরূপ জন্তু। ইহাকেই ধরিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে।

আসিতেছে যাইতেছে। সকলেরই দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরাইয়াছে। এখন মানুষ যে তাহার চাইতে বেশি দিনের জন্য আসিয়াছেন, এ কথা মনে করিবার আমাদের অধিকার কি? যাহা হউক, পাঠক পাঠিকারা এ-সকল কথা ভাবিয়া মন খারাপ করিবেন না। শেষে যাহাই ঘটুক আমাদের তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। পৃথিবীর বয়সের হিসাবে যাহা দুদিন, আমাদের পক্ষে তাহা ঢের দিন। সুতরাং এখন শেষ করি।

প্রাচীনকালের জন্তু

প্রবাসী—১৩১০

শ্রীযুক্ত এইচ্, এন্, হচিন্‌সন্ কৃত "Extinet Monsters" নামক পুস্তক হইতে ইগুয়ানোডোনের আবিষ্কারের নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সংগ্রহ করা গেল।

১৮২২ সালে ডাক্তার জি, এ, ম্যাণ্টেলের সহধর্ম্মিনী ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি টিল্‌গেট্ ফরেষ্ট্ নামক স্থানের প্রস্তরে এই জন্তুর একটি দন্ত প্রাপ্ত হন। তৎপর তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে অনুসন্ধান করিয়া ঐরূপ আরো অনেকগুলি দন্ত বাহির করেন। এ সকল দন্তের অনেকগুলিরই অগ্রভাগ পুনঃ পুনঃ চর্ব্বনজনিত ঘর্ষণে মসৃণ হইয়া গিয়াছে। গো মহিষাদি শষ্পাহারী স্তন্যপায়ী জন্তুদিগেরই কেবল ঐরূপ দন্ত দেখা যায়, সুতরাং ঐ দন্ত যে জাতীয় জন্তুর, তাহারা যে শষ্পাহারী ছিল, এবং খাদ্য দ্রব্যকে চর্ব্বন করিত, তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এই সন্দেহের অভাবই আর কি গুরুতর সন্দেহের কারণ হইয়া উঠিল। যে প্রস্তরে ঐ সকল দন্ত পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সরীসৃপ যুগের প্রস্তর। অর্থাৎ ঐ সময়ের প্রস্তরে সরীসৃপ জাতীয় জন্তুর চিহ্নই পাওয়া যায়; পৃথিবীতে তখনও স্তন্যপায়ী জন্তুর সৃষ্টি হয় নাই। সরীসৃপেরা কখনও তাহাদের খাদ্য চর্ব্বন করিয়া আহার করে না, তাহাদের আহার কেবল গলাধঃকরণ। সুতরাং ডাক্তার ম্যাণ্টেল ঐ দাঁতগুলিকে লইয়া বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। উহাদিগকে সরীসৃপের দন্ত বলিতে ভরসা হইতেছে না, কারণ সরীসৃপদিগকে কখনও চর্ব্বন করিতে দেখেন নাই। দাঁতগুলি দেখিতে কোন বৃহৎকায় স্থূলচর্ম্মী চর্ব্বণকারী জন্তুর দাঁতের মতন। কিন্তু ঐরূপ চর্ব্বণকারী জন্তুরা আজকাল সকলেই স্তন্যপায়ী অথচ সে সময়ে স্তন্যপায়ী ছিল না।

এরূপ অবস্থায় ডাক্তার ম্যাণ্টেল অদ্বিতীয় পণ্ডিত কুভিয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কুভিয়ে ঐ দন্ত দেখিয়াই বলিলেন যে উহা গণ্ডারের দাঁত! ইহার কিছুদিন পরে ঐ সকল প্রস্তরে জন্তু বিশেষের পায়ের হাড় কয়েকখানা পাওয়া গেল। ঐ হাড় দেখিয়া কুভিয়ে বলিলেন যে উহা গণ্ডারের খড়্গা। যে প্রস্তরে কোনদিন কোনরূপ স্তন্যপায়ী জন্তুর চিহ্ন পাওয়ার কথা শোনেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এতগুলি স্তন্যপায়ীর সমাবেশ ডাক্তার ম্যাণ্টেলের মনে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তিনি শ্রমজীবিদিগকে পুরস্কার দানে উৎসাহিত করিয়া বিশেষভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। ইহার

ফলস্বরূপ অনেকগুলি নিখুঁত দন্ত আবিষ্কৃত হইল। তখন দেখা গেল যে ঐ সকল দন্তের আকৃতি বর্তমান সময়ের ইগুয়ানা নামক গোধিকার দন্তের ন্যায়।

ডাক্তার ম্যাণ্টেলের প্রথমাবধিই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে প্রাচীনকালে চর্ব্বনকারী শস্পাহারী সরীসৃপ ছিল, এসকল দন্ত তাহাদেরই। সুতরাং ইগুয়ানার দন্তের সহিত ঐ সকল দন্তের উক্তরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। (ইগুয়ানা কীট এবং বৃক্ষপত্রাদি ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহা সে কেবল গলাধঃকরণই করিয়া থাকে, চর্ব্বণ করে না।) কিন্তু দেশীয় অন্যান্য পণ্ডিতেরা কেহই ডাক্তার ম্যাণ্টেলের মতের সমর্থন করিলেন না।

যাহা হউক, ঐ নূতন দন্তগুলি দেখিয়া কুভিয়ে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এবং মহাজনোচিত সরলতা সহকারে তাহা স্বীকার করিলেন। ডাক্তার ম্যাণ্টেল্‌কে তিনি লিখিলেন যে ঐরূপ দাঁত তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি ইহাও বলিলেন যে "এতদ্বারা একটি নূতন জন্তুর আবিষ্কার হইল—শস্পাহারী সরীসৃপ।"

বন্ধুদিগের পরামর্শে ডাক্তার ম্যাণ্টেল এই নূতন জন্তুর 'ইগুয়ানোডন', নামকরণ করিলেন - অর্থাৎ ইগুয়ানার মতন দন্ত বিশিষ্ট জন্তু।

এইরূপ দন্তের লক্ষণানুসারে জন্তুর নামকরণ প্রত্ন-প্রাণীবিদ্যা শাস্ত্রে বিরল নহে। প্রাচীনকালের অনেক জন্তুর নামকরণ এইরূপে হইয়াছে। যে জন্তুর ইগুয়ানার ন্যায় দন্ত, তাহার নাম ইগুয়ানোডন। যাহার স্তনের ন্যায় দন্ত, তাহার নাম ম্যাষ্টোডন্ (ম্যাষ্টস্ শব্দে গ্রীক ভাষায় স্তন বুঝায়)। যাহার যাঁতার ন্যায় দন্ত তাহার নাম মাইলোডন্ (মাইলস্=যাঁতা। যাহার দন্তের গঠন অত্যন্ত জটিল, তাহার নাম ল্যাবিরিন্থোডন (ল্যাবিরিন্থস্=গোলকধাঁধা), যাহার দন্তের আকৃতি ঘরের চালের ন্যায়, তাহার নাম ষ্টিগোডন (ষ্টিগস্ =চাল) ইত্যাদি।

যাহা হউক, আমরা ইগুয়ানোডনের বিবরণ এখনও শেষ করি নাই। এই জন্তুর আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে একদিকে যেমন এই কথা জানা যায় যে পণ্ডিতেরাও অনেক সময় ভুল করেন, অপর দিকে তেমনি ইহাও প্রমাণ হয় যে সদ্‌যুক্তির সহায্যে অতি সামান্য পদার্থ হইতেও মূল্যবান সত্য সংগ্রহ করা যায়।

ঐ দাঁতগুলির সহিত অনেক হাড় পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইহা স্বভাবতঃই অনুমতি হইল যে দাঁত যাহার, হাড়ও তাহারই। এক একখানি উরুর হাড় এক গজের অধিক দীর্ঘ। বর্তমান সময়ের কুম্ভীরগুলির দেহের ঐ হাড় এক ফুটের অধিক লম্বা হয় না। সুতরাং জন্তুটি যে অতিশয় বৃহৎ ছিল, তাহা সহজেই বুঝা গেল। ইহার কয়েক বৎসর পরে জর্ম্মনিদেশে অন্য এক জাতীয় অনেকগুলি ইগুয়ানোডনের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। এই জাতীয় ইগুয়ানোডন প্রথমোক্ত ইগুয়ানোডন অপেক্ষাও বৃহৎ। প্রথমোক্ত ইগুয়ানোডনগুলি প্রায় ২৪ ফুট লম্বা হইত, কিন্তু শেষোক্তগুলি ৩০ ফুটের কম হইত না।

ডাক্তার ম্যাণ্টেল যে স্থানে সেই দাঁত এবং হাড়গুলি পাইয়াছিলেন, সে স্থানে একপ্রকার বৃহৎ জন্তুর পদচিহ্নও দৃষ্ট হয়। ঐ পদচিহ্নও যে ইগুয়ানোডনের তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ ছিল না। এবং কিছুদিন পরে যখন ঐ জন্তুর আরও অস্থি পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল যে উহা যথার্থই ইগুয়ানোডনের পদচিহ্ন।

এই পদচিহ্ন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইগুয়ানোডন পক্ষীর ন্যায় পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর করিয়া চলিয়া বেড়াইত। সম্মুখের পা দুখানিকে যে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে দিত না। দিলে, তাহাদেরও চিহ্ন অবশ্য দেখা যাইত, কিন্তু ওরূপ চিহ্ন কেহ দেখিতে পায় নাই। পশ্চাতের পদদ্বয় এবং কটিদেশের গঠন অনেকাংশে পক্ষীর ঐ সকল অঙ্গের গঠনের অনুরূপ ছিল।

এইরূপে ক্রমে এই অদ্ভুত জন্তুর সম্বন্ধে সকল কথাই পরিষ্কার হইয়া আসিল। বাকি রহিল কেবল সেই শৃঙ্গাকৃতি অস্থি খণ্ড, যাহাকে কুভিয়ে প্রথমতঃ গণ্ডারের খড়্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ডাক্তার ম্যাণ্টেল বলিলেন যে উহা ইগুয়ানোডনের শৃঙ্গ। কিন্তু পণ্ডিত ওয়েন্ নানা কারণে উহাকে শৃঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে তাহার হাতের কিছু হইবে। বাস্তবিক কালে অই জন্তুর অক্ষুণ্ণ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে ওয়েনের কথাই ঠিক। ঐ জিনিষটা ইগুয়ানোডনের হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ।

এরূপ সৃষ্টিছাড়া অঙ্গুষ্ঠ দিয়া উহার বিশেষ কাজ হইত তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। ইচ্ছা করিলে উহা যে সাংঘাতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধকালে শত্রুর শরীরে, মূলাদি অন্বেষণ কালে মৃত্তিকায়, আহারের সময় নারিকেলাদি ফলের কঠিন আবরণে, ইত্যাদি নানা অবস্থায় ইহার নানারূপ ব্যবহার সম্ভব দেখা যায়।

ইগুয়ানোডনের অস্থির সঙ্গে নানারূপ উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে ঐ সময় ঝাউ, তাল, নারিকেল প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষাদির প্রাদুর্ভাব ছিল।

সরীসৃপ জাতীয় জন্তু। সে পক্ষীর ন্যায় দুইপদে ভর করিয়া চলিত, আর গো-মহিষাদির ন্যায় চর্ব্বন করিয়া শাক সবজী ভক্ষণ করিত। সুতরাং ইহার রীতিনীতি কিয়ৎ পরিমাণে শাস্ত্র বহির্ভূত হইবারই কথা।

চলনের ভঙ্গী এবং পদাদির অস্থির গঠনের সহিত পক্ষীর এরূপ সাদৃশ্য আরও বিস্ময়জনক। ক্রমে এইরূপ পক্ষীর লক্ষণ বিশিষ্ট বিস্তর জন্তু আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এই সকল জন্তুকে পণ্ডিতেরা সরীসৃপের শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া "ডাইনোসর" নামক এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন। "ডাইনোসর" শব্দের অর্থ ভীষণ সরীসৃপ। ইহাদের সকলকেই ইগুয়ানোডনের ন্যায় নিরামিশাষী ছিল না; অনেকেই ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মাংস খাইয়া জীবন ধারন করিত। ইঁদুরের মত ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া তিমির মতন বড়

পর্য্যন্ত সকল আকারেরই ডাইনোসর ছিল। হস্তী অপেক্ষা বৃহৎ, অশ্ব অপেক্ষা বেগবান, ব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র, ডাইনোসর অনেক ছিল। জল, স্থল, ব্যোম সর্ব্বত্রই—ইহারা বিচরণ করিত। চেহারার কথা আর কি বলিব। কাহারও শরীর বর্ম্মাবৃত কাহারও কলেবর কণ্টকাকীর্ণ। এক ব্যক্তির ২৫ ফুট দীর্ঘ বিশাল দেহে এবম্বিধ সজ্জার উপরেও আবার গলায় একটি হাঁসুলী কপালে দুটি শৃঙ্গ, নাকের উপর একটি খড়্গ এবং মুখে চঞ্চুর আভাস। রীতি মতন চঞ্চু বিশিষ্ট ডাইনোসরেরও অভাব ছিল না।

সর্ব্বশেষে পক্ষ বিশিষ্ট ডাইনোসর। ইহাদের চঞ্চুও ছিল পক্ষও ছিল। পাখা দুটি পক্ষীর পাখার মতন নয়, কতকটা বাদুড়ের পাখার মতন।

এই রূপে দেখা যায় যে ডাইনোসরদিগের সহিত পাখীর সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, বাস্তবিক পণ্ডিতদিগের সাধারণমত এই যে পাখীরা হয় ডাইনোসরদের বংশধর, না হয় অতি নিকট আত্মীয়।

ইহার প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীনকালের একটি পাখীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। ইহা অপেক্ষা পুরাতন কোন পাখীর চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতেরা ইহার নাম রাখিয়াছেন "আর্কি অপ্টেরিক্স" (পুরাতন পক্ষী)।

ইহার চঞ্চুও আছে দন্তও আছে। পক্ষীর ন্যায় ডানা অথচ তাহাতে তীক্ষ্ন নোখ যুক্ত অঙ্গুলি। সরীসৃপের ন্যায় দীর্ঘ লাঙ্গুল, কিন্তু সেই লাঙ্গুলের প্রত্যেক গ্রন্থির দুই পার্শ্বে দুটি পালক। মেরুদণ্ডের অস্থি সরীসৃপের ন্যায়।

প্রাচীনকালের অনেক পক্ষীর মুখে দাঁত এবং হাড়ে সরীসৃপ অথবা মাছের লক্ষণ দেখা যায়। কেবল পক্ষীতেই যে এইরূপ নানা শ্রেণীর জন্তুর লক্ষণ মিশ্রিত দেখা যায় তাহা নহে, অন্যান্য অনেক জন্তুই সরীসৃপ স্তন্যপাখী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর লক্ষণ এক শরীরে ধারন করিত।

বলিতে গেলে ইহার মধ্যে তেমন বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। প্রাচীনকালের রীতি এখনকার রীতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল, এই মাত্র। আর বর্ত্তমান সময়েও যে এরূপ মিশ্রণের দৃষ্টান্ত একেবারেই নাই, তাহাই বা কি করিয়া বলি। অষ্ট্রেলিয়ায় "ডাক মোল" (duck mole) নামক একটি ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তু অদ্যাপি জীবিত আছে। উহা স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু পক্ষী সরীসৃপাদির ন্যায় ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে এবং ইহার মুখে হংসের চঞ্চুর ন্যায় চঞ্চু।

পৃথিবীতে প্রথমে যে সকল জীবের জন্ম হইয়াছিল, তাহারা নিতান্তই নিকৃষ্ট জাতীয় ছিল। নানারূপ কীট এবং শম্বুকাদিই পৃথিবীর প্রথম প্রাণী। তৎপর চিংড়ি কর্কটাদি ; তৎপর মৎস্য ; তৎপর সরীসৃপ। এক সময়ে এই সরীসৃপেরা পৃথিবীতে অপ্রতিরথ প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। সংখ্যায় বলে, বিশালতায় কোন বিষয়েই ইহাদের প্রতিদ্বন্দী ছিল না। ডাইনোসরেরা ইহাদেরই দলভুক্ত ছিল। ইহার পরে পৃথিবীতে পক্ষী আসিয়াছিল। সর্ব্বশেষে স্তন্যপায়ী জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে আবার মানুষ সকলের কনিষ্ঠ।

স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি স্থূলচর্মী জন্তুর একসময়ে পৃথীবীতে বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। পৃথিবীর নানাস্থানে নানা আকারে ইহারা বিরাজ করিত।

এইরূপে অতিশয় বিচিত্র গতিতে পৃথিবীতে জীবপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রতার মধ্যে এক বিষয়ে লক্ষ্যের বিশেষ স্থিরতা দেখা যায়। জীব-প্রবাহের গতি ক্রমিক উন্নতির দিকে। পৃথিবীতে ক্রমেই উন্নত হইতে উন্নততর জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে।
